ইউনিট ৭

তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ডঃ পরিবহণ ব্যবস্থা

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, মানুষের আর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ডের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে পরিবহণ ব্যবস্থা যা মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। এক কথায় বলতে গেলে এটুকুই বলা যায় যে, পরিবহণ ব্যবস্থাই বিশ্বের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন তথা সচল ও সজীব রাখছে। অত্র ইউনিটটি ১২ টি পাঠের মাধ্যমে পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ না হলেও মোটামুটি ধারণা দেওয়া সম্ভব হবে।

পাঠ– ৭.১ ঃ পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ পরিবহণ কি তা বলতে পারবেন;
- ☞ পরিবহণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- ☞ পরিবহন ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- ☞ সমূদ্র পথের বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারবেন।

পরিবহণ ঃ পরিবহণ হচ্ছে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের তৃতীয় পর্যায়ভূক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং আজকের পৃথিবীর প্রায় ০.২০ অংশ লোকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মের সংস্থান দিচ্ছে এবং বলতে গেলে পরিবহণ ব্যবস্থার উদ্ভবেই পৃথিবীর এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের চাহিদা মাফিক উৎপাদিত শস্য বা বিষয়ে বিস্তরণ সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে এ পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে। কোন পণ্য সামগ্রীসহ মানুষ চলাচল অথবা শুধু মানুষ বা মালামাল চলাচলের মাধ্যম/ বাহনকে পরিবহণ হিসেবে অভিহিত করা হয়। অনেক অর্থনৈতিক ভূগোলবিদ পরিবহণকে ”পৃথিবীর সঞ্চালন ব্যবস্থা” বলে অভিহিত করে থাকেন। আজকেরর পৃথিবীর অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশেষ কোন লক্ষ্যবস্তুর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধার সুযোগে বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাদিত সামগ্রীকে সন্নিবেশ করণ যার মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্রে আবদ্ধকরণ যার মূলশক্তি পৃথিবীর উপরস্থ পরিবহণ জালিকা। পৃথিবীর কোন অংশ পরিবহণ খাতে বড় দূর্বল অথবা অস্তায়মান পর্যায়ে তার অর্থ সে অংশ মারাত্মভাবে বাঁকী দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। আবার কোন অঞ্চলের পরিবহণ ব্যবস্থা সুগঠিত হলে বুঝতে হবে সে তখন বাঁকী দুনিয়ার অংশের সঙ্গে চমৎকার স্বাস্থ্যপ্রদ সম্পর্ক বিদ্যমান।

৭.১.১ পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

পৃথিবীর বিভিন্ন পথ/রুটের বিকাশ ঘটেছে স্থলে, জলে ও আকাশে। মূল পথ গুলো সহজেই সনাক্তকরণ সম্ভব কেননা তাদের উপস্থিতি যেমন ট্রেলার, সড়ক, পাইপ ও রেলপথ ইত্যাদির মাধ্যমে। অভ্যন্তরীণ জলপথ গুলোও পরিস্কার ভাবে পৃথিবীকরণ সম্ভব। তবে সামুদ্রিক ও বিমানপথ সমূহ স্পষ্টত প্রাকৃতিকভাবেই প্রতীয়মান নয়। কিন্তু তাদের অদৃশ্য পথরাজি যে কোন সড়ক জালিকার ন্যায় অতি যত্নসহ চিহ্নিত সম্ভব। তাই সার্বিকভাবে পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিম্নভাবে আলোচিত হলোঃ

ক) পৃথিবীর নানা অংশের নানা প্রকৃতির জনসাধারণ ও উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর অভ্যন্তরীণ ও বহিঃজগতের বহন ও আদা প্রদানে পরিবহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

খ) পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের সম্পদ সংগ্রহ ও উন্নয়নে (প্রাকৃতিক বনজ, জলজ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি) পরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান।

গ) কৃষিজ ও কৃষি সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর উন্নতিতে যেমন আধুনিক প্রযুক্তিসহ কৃষি ব্যবস্থা ও পদ্ধতি, বীজ, সার, সেচ, বাজার ও বাজারজাত করণ প্রক্রিয়া, উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বিস্তরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার ভূমিকা অপরিসীম।

ঘ) শিল্পায়ন ও শিল্প স্থাপনে বিশেষ করে (১) বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ এবং সরবরাহ; (২) এক শিল্প কেন্দ্র থেকে অন্য শিল্প কেন্দ্রে পণ্য সামগ্রী বহন এবং (৩) শিল্পজাত দ্রব্যাদি বাজারজাত করণে পরিবহণের গুরুত্ব অনেক ক্ষেত্রে মূখ্য সঞ্চালক হিসেবে পরিগণিত।

ঙ) ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতির ক্ষেত্রে (যেমন- অন্তঃ ও বহিঃ বাণিজ্য ইত্যাদি) পরিবহণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

চ) নানা রকম প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন- বন্যা, খরা, নদীতীর ভাঙ্গন, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, হিমানী প্রপাত, মঙ্গা, অতিবর্ষণ, অল্প বৃষ্টি, নানা রকম রোগ ব্যাধি ইত্যাদি) মোকাবিলায় ও পূনর্বাসন ক্ষেত্রে পরিবহণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ছ) যুদ্ধ, অশান্তি, দেশ রক্ষা, সংকটকালে রসদ অস্ত্র শস্ত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

জ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের সহযোগিতা বিশ্বায়নের সুফল নিমিত্তে ও সংস্কৃতির শিক্ষা ও ক্রীড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবহণ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরিশেষে এটুকু বলা যায় যে, পৃথিবীর পরিবহণ ব্যবস্থা মানব দেহরূপ যার সচলতায় বিভিন্ন কার্যক্রম সচল অর্থাৎ এক অর্থে মানুষের অস্তিত্ব টিকে থাকা বা না থাকা নির্ণয় করে থাকে পরিবহণ ব্যবস্থা।

৭.১.২ বিভিন্ন প্রকার পরিবহণ ব্যবস্থা

পৃথিবীর পরিবহণ ব্যবস্থা মানবদেহ সম্পৃক্ত কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতির অনুরূপ। পৃথিবীর অর্থনীতি কতিপয় আন্তঃ পরিবহণ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল যা সমন্বিত ভাবে রেলপথ, সড়কপথ, পাইপ পথ, বিমানপথ এবং পানি পথসহ বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে যেমন, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিগ্রাফ, ডাক ব্যবস্থা এবং প্রকাশনাকে বুঝায়। মানবদেহের সঙ্গে এই সদৃশ্যের কারণে, অর্থনৈতিক ভূগোলবিদগণ পরিবহণ কে পৃথিবীর সঞ্চালন ব্যবস্থা বলে অভিহিত করে থাকেন যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ পরিবহণ ব্যবস্থা পণ্য সংগ্রহ বহণ ও মানুষ চলাচলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। যার সূচনা অতি প্রাচীনকালে এবং কালের বহু বিবর্তনে বর্তমানে ও এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবহণের স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যসহ ক্রমবিকাশ ঘটেছে জলে, স্থলে ও আকাশে এবং সম্ভব করেছে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আন্তঃ সম্পর্ক ও বন্ধন হ্রাসকরণেরর প্রচেষ্টা বিদ্যমান রয়েছে নানা ধরনের রাষ্ট্রীয় সামাজিক বৈষম্য এবং সর্বোপরি দূরকে করেছে অনেক কাছের।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে পরিবহণ হচ্ছে মানুষ ও উৎপন্ন সামগ্রীর চলাচল বা স্থানান্তর প্রক্রিয়া যার শুরুর প্রকৃত তারিখ অজানা থাকলেও সম্ভবতঃ মানব সভ্যতার কোন এক উষালগ্নে এর সূচনা হয়েছে যা এখনও বিদ্যমান এবং চলবে অনাদিকাল ধরে। তবে এটা ঠিক যে, পরিবহণের উদ্ভব হয়েছে জল, স্থল ও আকাশ ভাগে এবং সময়ের প্রেক্ষাপটে এর বিভিন্ন পরিবর্তন, সংযোজন ও উন্নয়ন ঘটে মূলতঃ অবয়ব একই রেখে। তাই আলোচনার সুবিধার্থে পৃথিবীর এই পরিবহণ ব্যবস্থাকে স্থল, জল ও বিমান এ তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

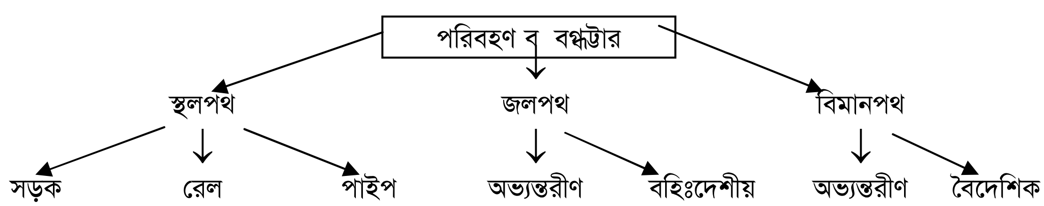

স্থল পরিবহণ ঃ পায়ে হেটে, গরুগাড়ী, উটের পিঠে, গাধার পিঠে, টমটম, ভ্যান, সাইকেল, মোটর সাইকেল, মোটরগাড়ী, ট্রাক, লরি, পাইপ, ইত্যাদি যানবাহনের মাধ্যমে মানুষ ও তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর ভূ-পৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন স্থলভাগের যে সব পথ ব্যবহৃত হয় তাকে স্থলপথ বা স্থল পবিরহণ বলা হয়। স্থলপথের শুরু সম্ভবতঃ মানুষ আবির্ভাবের পর থেকে এবং এখনও যার কোন শেষ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর রেলপথ ও বিংশ শতাব্দীর মোটরযান উদ্ভবের ফলে আকস্মিকভাবে স্থল পরিবহণের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। যান্ত্রিক শক্তির অনুপ্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত মানুষ ও মালামাল পশুশক্তি পায়ে হেটে অথবা নৌকায় পরিবহণ করতো। এখন যদিও এসব ভ্রমনের আদিম উপায় সমূহের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। তথাপি পৃথিবীর অনেক অনুন্নত দেশসমূহের লোক চলাচল ও পণ্য সামগ্রীর পরিবহণ এসবের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। স্থলপথ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন- পায়ে চলার উপযোগী ফুটপাত ও গলিপথ, কাঁচা রাস্তা পথ, পাকা রাস্তা, সড়ক (জাতীয় ও হাইওয়ে) রেলপথ (মিটার ও ব্রডগেজ উভয়ই হতে পারে) ইত্যাদি। বিভিন্ন আন্তঃগ্রাম ও অঞ্চলে যাতায়াত স্থলপথই সুবিধাজনক এতে খরচ ও সময় কম লাগে। তবে যে কোন ধরনের দূঘটনা ঘটতে পারে।

জলপথ ঃ ভেলা, নৌকা, জাহাজ, স্টীমার, লঞ্চ, স্পীডবোর্ড, কারগো, ইত্যাদি ধরনের যানবাহনের সাহয্যে ভূ-পৃষ্ঠস্থ খাল, বিল নদী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জলভাগের উপর দিয়ে মানুষজন ও পণ্য সামগ্রীর আনা-নেওয়াই হচ্ছে জল পরিবহণ। মানুষ উদ্ভাবিত প্রাচীন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার অন্যতম হচ্ছে জলপথ। ফোনিক্স, গ্রীস ও রোমীয় নাবিকগণ তৎকালে ভূমধ্যসাগর ও তার তীরবর্তী আটলান্টিক মহাসাগর সংলগ্ন এলাকায় নাব্যতার কারণে নৌকায় পাল তুলেও দাঁড় বেয়ে ২/৩ বার পাড়ি দিত, যা ছিল তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমের অংশবিশেষ। ভূমধ্যসাগরকে সন্নিবেশ করে নতুন পৃথিবীর প্রধান জাহাজ পথের আবিস্কার পর্যন্ত এটি বলবৎ ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর আবিষ্কার যুগে সামুজিক বাণিজ্য পথের উন্মেষ ঘটে। ফলে জলপথে পণ্য বহণকারীরা পাল তুলে যে কোন লাভজনক বাজার অথবা মালবাহী জাহাজ কারগোর উদ্দেশ্যে পৃথিবীর যে কোন অংশে পাড়ি দিতে শুরু করে।

জলপথ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় প্রকারের হতে পারে। এ পথে বেশী পরিমাণে পণ্য সামগ্রী ও লোকজন যাতায়াত করতে পারে, তাতে খরচও কম হয় কিন্তু সময় বেশি লাগে। তবে এ পথ ঝুঁকি বহুল বিশেষ করে ঝড় সাইক্লোন ও শুকনো মৌসুমে।

বিমান পথ ঃ হেলিকপ্টার, এ্যারোপ্লেন, বোয়িং বিমান, জেট ইত্যাদির মাধ্যমে আকাশ পথে স্বল্প সময়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে বিশেষ করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াতই হচ্ছে বিমান বা আকাশ পথ। বিমান পরিবহণের বিকাশ হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বেশীর ভাগ দেশেই অগ্রগামী বেসামরিক বিমান পথের শুরু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অল্প পরে। এটি দু ধরনের যেমন- অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক। বিমান পথে চলাচল বেশ ব্যয় সাধ্য এবং সাধারণতঃ সমাজ/রাস্ট্র/দেশের অর্থশালী /বিত্তশালী লোকজনই এ পথে ভ্রমণ করে থাকেন। বেশি ব্যয় কার্যক্রমের কারণে বেশিরভাগ বাণিজ্যিক বিমান পরিবহণ টিকে থাকার নিমিত্তে সরকার থেকে ভর্তুকী দিয়ে থাকে।

৭.১.৩ পরিবহণ ব্যবস্থা সমুদ্র পথ

সমুদ্র পথ ঃ পরিবহণ ব্যবস্থার অন্যতম জলপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে সমুদ্র পথ। সমুদ্র পথের মাধ্যমে সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়ে থাকে তাই একে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথও বলা হয়ে থাকে। এ পথ দিয়ে নানান ধরনের ভারবাহী যানবাহন চললেও মূলতঃ লাইনার, কারগো, লাইনার, ট্রাম্প, ট্যাংকার ইত্যাদি শ্রেণীর যানবাহনের প্রাধান্য বিদ্যমান। লাইনার জাহাজ দিয়ে পৃথিবীর পরিবাহিত যাত্রী ও পণ্য সামগ্রীর প্রায় ৭৫% এ পথে যাতায়াত করে থাকে। অর্থাৎ আধুনিক ধরনের সামুদ্রিক জাহাজের সমুদ্রপথে অনুপ্রবেশের কারণে পণ্যসামগ্রী ও যাত্রী সাধারণ নিরাপদে ও দ্রুতগতিতে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পাড়ি দেয়। সম্ভব হয় এবং বিভিন্ন মহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও এলাকাকে সংযুক্ত করণ অতি সহজও হয়ে যায়। বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র এখন বিশাল জালিকা সদৃশ্য সমুদ্রপথের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিচিত্র রকমের উৎপন্ন সামগ্রীর সমাবেশ ঘটে। সাগর পথকে ঘিরে আর যেখান থেকে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ স্থানে বিস্তরণ প্রক্রিয়া সহজরূপে প্রকাশিত হতে থাকে।

সমুদ্র পথের সুবিধাবলী ঃ সমুদ্র পথই পণ্য সামগ্রীসহ যাত্রী বহনের উত্তম মাধ্যম যার ব্যয় সবচেয়ে কম এবং সকল দেশ ও জাতির জন্য উন্মুক্ত কিন্তু বিশাল, কোন শুল্ক প্রদান করতে হয় না এবং বিশালত্বের কারণে চলাচলের ক্ষেত্রে পারস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের কোন সম্ভাবনা থাকে না। এ পথের প্রধান প্রধান সুবিধাবলী নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. স্থলভাগের ন্যায় সমুদ্র পথ নির্মাণ করতে হয় না। তাই এতে কোন নির্মাণ খরচ নেই বা প্রয়োজন পড়ে না। ইহা প্রকৃতির দান এবং কোন দেশ বা জাতির নিজস্ব সম্পত্তি নয়। শুধু জাহাজের জন্য পোতাশ্রয় রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্তে ব্যয় করতে হয় মাত্র।
২. সমুদ্র পথে চলাচলকারী জাহাজসমূহ বিশালকার যাতে পরিবহণ ব্যয় ও বেশি কিন্তু বাহিত বোঝার উপর সে ব্যয়ভার বন্টিত হয়ে থাকে। ফলে পরিবহণ খরচ টন প্রতি অনেক কমে আসে অর্থাৎ টন প্রতি পরিবহণ ব্যয় কম।
৩. তুলনামূলকভাবে জলপথ শ্লথ গতির কারণে জ্বালানী বাবদ খরচ কম হয়।
৪. সমুদ্রপথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বাধা নিষেধ থাকে না। উপরন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ও তাদের কৃষ্টি, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয় এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়।

আবার নানা প্রকার বাধাবিপত্তি ও ঘটে থাকে সমুদ্র পথে, যেমন জাহাজ ডুবি, পরিবেশ দুষণ, বিভিন্ন অজানা রোগ ব্যাধির বিস্তার ইত্যাদি ঘটার প্রচুর সম্ভাবনা বিদ্যমান।

৭.১.৪ পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সমুদ্র পথ সমূহ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমুদ্র পথ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিনিময়ের মাধ্যমে বৃহত্তর আন্তঃমহাদেশীয় তথা মহাদেশীয় সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে পরিচিত। সমুদ্র পথগুলো নির্দিষ্ট পথ দিয়ে যাতায়াত করে থাকে যা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত ও চিহ্নিত। নানান প্রকারের পথ থাকলেও প্রধান প্রধান সমুদ্র পথ গুলো বিখ্যাত। যেমন-

১. উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথ;
২. দক্ষিণ আটলান্টিক সমুদ্র পথ;
৩. প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্র পথ;
৪. ভূ-মধ্যসাগরীয়-এশীয় সমুদ্র পথ বা ভূ-মধ্যসাগরীয়-সুয়েজ খাল পথ।
৫. উত্তমাশা অন্তরীপ পথ এবং
৬. পানামা খাল পথ।

নিম্নে এদের সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলোঃ

১। উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথ ঃ যাত্রী ও পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলের ভিত্তিতে উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথটি পৃথিবীর বৃহত্তম, ব্যস্ততম ও গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র পথ। ইহা উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশের বন্দরসমূহ হতে পশ্চিম ইউরোপের বন্দরগুলোর মধ্যে সংযোগস্থাপনকারী পথ। এটি একটি বৃহত্তর বৃত্তপথ যা উত্তর আটলান্টিককে দ্বিখন্ডিত পূর্বক নোভাস্কোটিয়া উপকূল সীমা বরাবর নিউফাউন্ডল্যান্ডের দক্ষিণে গ্রান্ড ব্যাংক অতিক্রম করে আটলান্টিক বরাবর বক্রপথ পর্যন্ত চলে গেছে। এ সমুদ্র পথটি প্রায় ৫০ মাইল প্রশস্ত এবং ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে পথটির স্থানান্তর ঘটে। শীতকালে ইহা উত্তর দিকে এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিকে সরে যায়। সম্ভবতঃ গ্রীষ্মকালে জাহাজ চলাচল পথে আইসবার্গের উপস্থিতি বিদ্যমানের কারণে এরূপ হয়।

উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথ দিয়ে বিভিন্ন প্রকৃতির পণ্যসামগ্রী পরিবাহিত হয়ে থাকে, যা আটলান্টিকের উভয় পার্শ্বের গঠিত উন্নত অর্থনৈতিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার প্রতিফলন প্রকাশ পায়। কেননা ইউরোপের প্রয়োজন খাদ্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামাল যার বেশীর ভাগই পাড়ি জমায় আটলান্টিকের পূর্বাংশে-গম, দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্যাদি, লাঙ্কারিং খনিজ দ্রব্যাদি কানাডা হতে; বিভিন্ন শস্য, তুলা, গন্ধক, খনিজ তৈল এবং ছাট লৌহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থেকে; খনিজ তৈল, চিনি এবং ফলমূল ক্যারিবীয় দ্বীপসমূহ থেকে। সাধারণভাবে, পূর্বদিকের কাঁচামাল ও খাদ্য সামগ্রীর প্রবাহ, পশ্চিম দিকের প্রবাহের চেয়ে বেশি। পশ্চিমে পণ্যসমূহের ভিতর স্পেন হতে পাইরাইটস; কাগজ মন্ড ও নিউজপ্রিন্ট স্কেন্ডিংনেভিয় দেশ সমূহ থেকে জার্মানী ও ফ্রান্স থেকে; পটাশ এবং বৃটেন থেকে চীনামাটি।

শিল্পজাত দ্রব্যাদির চলাচল কাঁচামাল ও খাদ্যের তুলনায় বরং বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এতে প্রচলিত হচ্ছে ইউরোপ ও অ্যাংলো আমেরিকান শিল্পায়ন অবকাঠামো। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে প্রেরণ করে Mass produced machines এবং তার পরিবর্তে সে গ্রহণ করে থাকে বিশেষ ধরনের ধাতব প্রস্তুত পদার্থ, যেমন- ঘড়ি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং জটিল ধরনের যন্ত্রপাতি।

বর্তমান বৎসরগুলোতে পর্যটন ব্যবসার দ্বারা যাত্রী সেবার প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যাত্রী চলাচল একটি ঋতুভিত্তিক ঘটনা এবং পর্যটন ঋতুর প্রথম সপ্তাহগুলো অনেক জাহাজ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাহাজ ভর্তি যাত্রী নিয়ে ইউরোপের দিকে ফিরে আসে অথবা আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে একদিকে পূর্ণতা পায়। জুন ও জুলাই মাসে পূর্বদিকে এবং আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরের প্রথম পর্যন্ত পশ্চিম দিকে প্রবাহ মাত্রা বেশি থাকে। যাত্রী বাহিত জাহাজগুলো সাধারণতঃ ডাক ও স্বল্প পরিমাণ বেশী মূল্যের পণ্য সামগ্রীও বহন করে থাকে।

উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এর প্রভাব

উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথ ঃ পৃথিবীর বৃহত্তম, সর্বাধিক ব্যস্ততম এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র পথ হিসেবে পৃথিবীর বুকে উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথের ব্যাপক পরিচিতি বিদ্যমান। পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিমিত্তে যাতায়াতকারী জাহাজগুলোর বেশির ভাগই এ পথে চলাচল করে থাকে এবং যাত্রী ও পণ্যসামগ্রী পরিবহণে এ পথের সমকক্ষ আর কোন পথ নেই। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এর গুরুত্ব অপরিসীম এবং এর প্রভাব অত্যন্ত বেশি। নিম্নে এর কয়েকটি প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

ক) অবস্থানগত কারণে ঃ উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথের উভয় পার্শ্বে উত্তর আমেরিকার অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল, কানাডা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাঞ্চল, পশ্চিম ইউরোপের আফ্রিকার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ইত্যাদি অবস্থিত যাদের অধিকাংশ বৃত্তশালী তৎসঙ্গে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, নানাবিধ শিল্প সামগ্রী, কৃষিজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এ পথের পণ্যসামগ্রীসহ যাত্রীর মাধ্যমে আদান প্রদান সহজসাধ্য, স্বল্প ব্যয় ও সময়ে সম্ভব যা অতীত থেকে চলে আসছে এবং বর্তমানে তার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে সুয়েজ খাল উন্মোচনের পর থেকে।

খ) সুয়েজ খাল উন্মোচনের কারণে ঃ ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল উন্মোচনের ফলে দক্ষিণ এশিয়া ও ইউরোপসহ অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দূরত্ব ৫৬৩৫ কিমি.হ্রাস পায় এবং পণ্যদ্রব্যসহ যাত্রী পরিবহণ প্রক্রিয়া আরো সহজতর ও নিকটতর হয় বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে পেতে থাকে।

গ) অধিক মাত্রায় যাত্রীসহ পণ্য সামগ্রী পরিবহণের কারণে ঃ পূর্বের আলোচনা থেকে জানা গেছে যে, উত্তর আটলান্টিকের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত দেশগুলো নানাবিধ শিল্পসামগ্রী উৎপাদনসহ আমদানী রপ্তানী কার্জেও শীর্ষ স্থানে অবস্থান করে। তাই সাধারণ নিয়মে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকে গম, ভুট্টো, যব, তুলা, তামাক, কাগজ, কাষ্ঠমন্ড, খনিজ তৈল, বস্ত্র, দুগ্ধজাত দ্রব্য, গবাদি পশু ও মাংস, লৌহ ও ইস্পাত জাত দ্রব্যাদি; অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড হতে লৌহ আকরিক পশ্চিম ইউরোপসহ দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বাজারে এবং পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে চিনা, লৌহ আকরিক, কাষ্ঠমন্ড, সিমেন্ট, ও বিভিন্ন বিলাস সামগ্রী উত্তর আমেরিকার বাজারে রপ্তানী করা হয়। তাই উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথ এসব পণ্য সামগ্রী বোঝাই জাহা, কার্গো ইত্যাদিতে জমজমাট থাকে যা আর অন্য কোন পথে পরিদৃষ্ট হয় না। পৃথিবীর সর্বমোট সমুদ্র গামী জাহাজের ২৫ ভাগ জাহাজ এ পথে যাতায়াত করে থাকে। সেজন্যই এ পথকে পৃথিবীর ব্যস্ততম ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ নামে অভিহিত করা হয়।

ঘ) অনুকূল সমুদ্র তলদেশের ভূ-প্রকৃতির কারণে ঃ সমুদ্র তলদেশের ভূ-প্রকৃতি বিশেষ করে সমুদ্রের গভীরতা, বিভিন্ন মগ্নচড়া, বা বিক্ষিপ্ত দ্বীপ ভূমির অবস্থান, ভগ্ন উপকূল রেখার উপস্থিতি ইত্যাদি ভৌগোলিক নিয়ামকের নিয়ন্ত্রণমূলক প্রভাব রয়েছে। উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথের সমুদ্রের গভীরতা বেশি, মগ্নচড়া বা বিক্ষিপ্ত দ্বীপভূমির সংখ্যা খুবই কম এবং উভয় প্রান্তের উপকূল রেখা বেশি ভগ্ন যা স্বাভাবিকভাবেই বন্দর, বাণিজ্য কেন্দ্র, পোতাশ্রয়, নিরাপদে জাহাজ চলাচলে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বোঝাই পূর্ণ জাহাজগুলো উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথ অনুসরণ করে থাকে। যদিও অন্যান্য পথেও জাহাজ চলাচল করে। তবুও পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ, যাত্রীর সংখ্যা, জাহাজ ও বিভিন্ন কার্গের সংখ্যা, বিশ্ব বাণিজ্যের মোট আয় ইত্যাদির বিবেচনায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথে উল্লেখযোগ্য বন্দরসমূহ

আমরা জানি যে, কতকগুলো অনুকূল ভৌগোলিক উপাদানের উপস্থিতিতে মূলতঃ বন্দর গড়ে উঠে। বিশেষ করে এ সমুদ্র পথের উভয় ধারে বহু ভগ্ন উপকূল ও খাড়ির উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবে সাহায্য করেছে অগণিত বন্দর তথা লন্ডন ও নিউইয়র্কের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। উল্লেখযোগ্য বন্দরগুলো হচ্ছে পশ্চিম উপকূলের, যেমন, নিউইয়র্ক, রোস্টন ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর (যুক্তরাষ্ট্র); হ্যালিফ্যাক্স কুইবেক, মন্ট্রিল (কানাডা); এবং পূর্ব উপকূলস্থ ম্যানচেস্টার, লিভারপুল, ব্রিস্টল, গ্লাসগো (যুক্তরাজ্য), লে হাভার (ফ্রান্স), হামবুর্গ ও ব্রিয়েন (জার্মানী), রটারডাম, আমস্টারডাম (হল্যান্ড), ষ্টকহোম (সুইডেন), ও লিসবন (পর্তুগাল)।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আন্তর্জাতিক জলপথ বা বাণিজ্য পথের মধ্যে উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথ সবচেয়ে বড়। উভয় কুলে ইউরোপের মত শিল্পোন্নত ও খনিজ সমৃদ্ধ দেশ আর আমেরিকার মত শিল্পোন্নত, খনিজ, বনজ ও খাদ্য সমৃদ্ধ দেশ বিদ্যমান যা এ পথকে সর্বদাই ব্যস্ত রাখে ও সচল থাকে। তাছাড়া প্রাকৃতিক কারণে অনেক জনবহুল শহর বা বন্দর গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশও এ পথে বিদ্যমান রয়েছে।

খ) দক্ষিণ আটলান্টিক সমুদ্র পথ ঃ পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার পূর্ব প্রান্তের বন্দরসমূহের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব প্রান্তের জলপথের সংযোগই দক্ষিণ আটলান্টিক সমুদ্র পথ নামে অভিহিত। এ পথটি পূর্ব পশ্চিমের চেয়ে উত্তর দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। এ পথে যেসব জাহাজ চলাচল করে থাকে তার ভিতর দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশসমূহের উৎপাদিত কৃষিজ পন্য সামগ্রী বিশেষ করে রবার, চিনি, কোকো, কফি, গম, মাংস চামড়া, তুলা, গবাদি পশু ইত্যাদি মার্কিন মল্লুক সহ পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন বন্দরে বাহিত হয়ে থাকে এবং বিনিময়ে এসব স্থানের শিল্পজাত দ্রব্যাদি দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ আমদানী করে থাকে। এ সমুদ্র পথে অনেকগুলো বিখ্যাত বন্দর যেমন হাভানা, ভেরাক্রুজ, জর্জটাউন, ট্যাম্পিকো, মন্টিভিডো, রিও ডি জেনিরো, বুয়েনস-আয়ার্স, স্যান্টোর্মা প্রভৃতি বন্দরসমূহে মালপত্র উঠানামা করে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ যেমন ভেনিজুয়েলা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পশ্চিম ইউরোপের বহু দেশ যেমন- যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড ইত্যাদি; উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো এবং আফ্রিকা মহাদেশের মরক্কো, মৌরিতানিয়া, ঘানা, সেনেগাল, নাইজেরিয়া, কঙ্গো, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইত্যাদি দেশ এ বাণিজ্য পথের উপর অনেকাংশ নির্ভরশীল। বর্তমানে এ পথের তৎপরতা বেশ ব্যাপক হারে বৃদ্ধির কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

গ) প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্রপথ/ট্রান্সপ্যাসিফিক সমুদ্রপথ ঃ প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন বন্দরের সঙ্গে এশিয়া মহাদেশের পুর্ব প্রান্ত ও অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বন্দরগুলোর সংযোগ যে জলপথের মাধ্যমে স্থাপিত তাকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় জলপথ নামে অভিহিত করা হয়। গুরুত্বের তারতম্যের কারণে এই সমুদ্র পথকে প্রধানত উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্র পথকে দ্বিধা বিভক্ত করা হলেও পরবর্তীতে চারটি বিভাগে ভাগ করা হয় যেমন, ক) সিডনী অকল্যান্ড-ফিজি-হনলুলু-সানফ্রান্সিসকো-ভ্যানিকুভার, খ) ম্যানিলা-নাগাসাকি-কোবো-হংকং-সাংহাই-ইয়াকোহামা হয়ে ভ্যানুকুভার, (গ) ম্যানিলা-হংকং-সাংহাই-হনলুলু-সানফ্রান্সিসকো এবং (ঘ) মেলবোর্ন-সিডনী-অকল্যান্ড-ওয়েলিংটন পানামা। অর্থাৎ বলা যায় যে, প্রশান্ত মাহসাগরীয় সমুদ্র পথ কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র পথের সমাহার এবং কাজ মূলতঃ প্রশান্ত মহাসাগরীয় উভয় তীরবর্তী বন্দর ও দেশসমূহের যাত্রীসহ মালামাল পরিবহণ যা সাধারণতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হতে জাপান এবং পূর্ব এশীয় দ্বীপপুঞ্জসহ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বন্দরসমূহের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্র পথের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথ হচ্ছে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্র পথ এবং এ পথটি পশ্চিমে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সঙ্গে জাপান এবং পূর্ব এশীয় প্রধান ভূমির সংযোগ স্থাপনকারী। এ সমুদ্রপথের উত্তরে আটলান্টিকে আইসবার্গের উপস্থিতির জন্য ঋতুভিত্তিক স্থানান্তর কার্যক্রম বিদ্যমান এবং সম্ভবতঃ পথ বরাবর তীরবর্তী এলাকায় বজায়মান ঝড়ো হাওয়া ও কুয়াশাচ্ছন্নতা, বিশেষ করে অ্যালুশিয়ান দ্বীপ সন্নিকটে শীতকালীন স্থানান্তর দক্ষিণমুখী শান্ত পানির সন্ধানে। ইহা প্রায় ৪৩০০ মাইল দীর্ঘ, ওয়াশিংটনের পাগেট সাউন্ড থেকে জাপানের ইয়োকোহামা পর্যন্ত।

দ্বিতীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্র পথের একটি অংশ পশ্চিমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যাাত্রা করে হাওয়াই দ্বীপ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে এবং এখানে পাখার মতো চতুদিকে ছড়িয়ে পড়েছে জাপান, ফিলিপাইনসহ এশীয় মূল ভূখন্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড। হাওয়াই দ্বীপকে প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগ স্থান হিসেবে অভিহিত। এই পথটি প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে যুক্তরাষ্ট্র হতে দুর প্রাচ্য পর্যন্ত সুবিধাজনক আবহাওয়া এবং হনলুলুর ব্যাপক বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগের কারণে ইদানিং বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ দিয়ে দূর প্রাচ্যের দেশসমূহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হতে তুলা, কাষ্ঠ মন্ড, গম, খনিজ তৈল, ছাট লৌহ ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্যাদির চাহিদা বিদ্যমান থাকায় সেগুলো জাহাজ ভর্তি অবস্থায় যেয়ে থাকে অথচ এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া থেকে তুলনামূলক কম চা, রেশম, মাংস, তৈলবীজ, রেডিও, ক্যামেরা, খেলনা, ইত্যাদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় যাতায়াত করে। এ সমুদ্র পথে ইয়োকোহামা, হনলুলু, হংকং, সাংহাই, ম্যানিলা, সিডনী, মেলবার্ন, ভানকুভার ও সানফ্রান্সিসকো উল্লেখযোগ্য সমুদ্র বন্দর।

ঘ) ভূমধ্যসাগর-এশীয় সমুদ্র পথ অথবা ভূমধ্যসাগর সুয়েজ খাল পথ ঃ পশ্চিম ইউরোপ থেকে ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর এবং ভারত মহাসাগর হয়ে দূরপ্রাচ্য ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে অবাধে যাতায়াত করে থাকে যে পথটি সেটি হচ্ছে ভূমধ্যসাগরীয় সুয়েজ খাল পথ। বিশেষ করে ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খালের উন্মুক্তের পর থেকে এবং এটিই বাস্তব ক্ষেত্রে ইউরোপ থেকে সমস্ত পানি পথ এশিয়া পর্যন্ত পরিগণিত হয়। উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথের পরেই এটিই হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র পথ (পণ্য সামগ্রী বহন ও যাত্রী পারাপার ক্ষেত্রে) যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০০০ মাইলেরও উপর এবং প্রাকৃতিক ভাবেই এটি বেশ কিছু সুবিধা ভোগ করে থাকে, যেমন- প্রাকৃতিক ভূমিরূপের মধ্যে সবচেয়ে কম সংখ্যক ঝড়ো হাওয়া ও কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থা বিরাজ করে। এ পথটি অনেক বন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত বিধায় মালামালসহ বহু যাত্রী দ্রুততর সময়ে ও নিরাপদে সরবরাহ সম্ভব। তাছাড়া বেশীর ভাগ বন্দরে পুনঃ জ্বালানীর সুযোগ বিদ্যমান, ফলে অনেক জাহাজের স্থান সংকুলানে কোন অসুবিধা হয় না।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, এই সমুদ্র পথে পশ্চিম ইউরোপীয়, ভূমধ্যসাগরীয়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বিভিন্ন বন্দর মারফত যোগাযোগ বিদ্যমান রয়েছে এবং ইউরোপের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে জিব্রালটার প্রণালী ও সুয়েজ খালের মাধ্যমে ভায়া এডেন বন্দর হয়ে এশিয়াসহ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মধ্যে যাতায়াত সহজ, সুলভ ও বেশি নিরাপদ রূপে পরিগণিত। আবার এটিই ইউরোপ ও প্রাচ্যের মধ্যে যাত্রীসহ মালামাল পরিবহণের একমাত্র বাণিজ্যিক পথ। আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এশীয় দেশসমূহ থেকে চা, রেশম, পাট, তৈলবীজ, চামড়া, পশম, দুগ্ধজাতদ্রব্য, রবার, খেজুর, কফি, আকরিক লৌহ, সোনা, তামা ইত্যাদি ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে এবং ইউরোপ থেকে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানী দ্রব্য হিসেবে আদান প্রদান হয়ে থাকে। এ সমুদ্র পথে অনেকগুলো বন্দরে জাহাজে মালামাল উঠানাম করে থাকে, যেমন- লন্ডন, লিভার পুল, এডেন, জিব্রালটার, জেদ্দা, করাচী, কলম্বো, মাদ্রাজ, চট্টগ্রাম, চালনা, কলিকাতা, হংকং, সাংহাই, টোকিও, ম্যানিলা, মেলবোর্ন, জাকার্তা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ঙ) উত্তমাশা অন্তরীপ পথ ঃ ভাস্কোদাগামা কর্তৃক এ পথটি আবিস্কারের পূর্বে এ পথই একমাত্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাধ্য যাতায়াত মাধ্যম ছিল এবং সুয়েজ খালের উন্মোচনের পর এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। এ পথ দিয়ে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন বন্দর হতে আফ্রিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল বরাবর উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে কেপটাউন ও ফ্রিম্যান্টল, কেপটাউন, সিঙ্গাপুর ভায়া কলম্বো কেপটাউন-এডেন বোম্বাই বন্দর পর্যন্ত যাতায়াত করা সম্ভব বিশেষ করে ভারী ও বড় ধরনের যানবাহন পরিবহণ এ পথই বেশি সুবিধাজনক। এ পথে সোনা, লৌহ আকরিক, হীরক, কাষ্ঠ, চামড়া, কোকো, দুগ্ধজাত দ্রব্য, গম, ভূট্টো, ফলমূল ইত্যাদি পরিবাহিত হয়ে থাকে। আবার ফিরতি পথে কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রী আমদানী হয়ে থাকে। এ পথে লিভারপুল, কার্ডিং, সোয়ানসী, লে হাভার, লিসবন, কেপটাউিন, ইস্টলন্ডন, করাচী, বোম্বাই কলম্বো, চালনা, চট্টগ্রাম, সিঙ্গাপুর, সিডনী, মেলবোর্ন ইত্যাদি বন্দরসমূহ পড়ে।

চ) পানামা খাল পথ ঃ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী প্রায় ৬০০ কিমি দীর্ঘ কিন্তু সংকীর্ন পানামা যোজক বিদ্যমান যা পরবর্তী ১৯১৪ সালে ৮০ কি. মি. দীর্ঘ খাল খননের মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পানামা খালের মাধ্যমে আমেরিকার উভয় অংশের কুল তীরবর্তী অঞ্চলসহ অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান ইত্যাদি দেশসমূহের সঙ্গে বিভিন্ন মালামালসহ যাত্রী পারাপার ও সম্পর্ক স্থাপন অতি সহজ ও সমৃদ্ধ হয়েছে। এ পথ দিয়ে চা, চিনি, তৈলবীজ, তুলা, কাঠ, কাগজ, গবাদি পশু, সোয়াবিন, শন, মাংস, গম, নানাবিধ যন্ত্রপাতি, শিল্পজাত দ্রব্যাদির আদান প্রদান হয়ে থাকে। এ সমুদ্র পথের উল্লেখযোগ্য বন্দরসমূহ হচ্ছে ভ্যাংকুবার সানফ্রান্সিসকো, লস এঞ্জেলস, বুথেনস থায়ার্গ, অকল্যান্ড, ওয়েলিংটন, সিডনী, মেলবার্ন, সিঙ্গাপুর, টোকিও ইয়োকোহামা প্রমুখ।

সুয়েজ খাল পথের বিবরণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এর প্রভাব

সুয়েজ খাল ঃ জলপথ তথা সামুদ্রিক পথের অন্যতম সুয়েজ খাল পথ যা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং জলপথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে এর পরিচিতি রয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট অবদান বিদ্যমান। প্রখ্যাত ফরাসী প্রকৌশলী ফার্ডিনান্ড ডি লেসেপস এ খাল পথের পরিকল্পনাকারী এবং তাঁরই নেতৃত্বে ১৮৫৯ সালে খাল খননের কাজ শুরু হয় এবং প্রায় ১০ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯৬৯ সালে জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এ পথটি উত্তরে ভূমধ্যসাগরের সহিত দক্ষিণে লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করেছে যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬৬ কিমি, প্রস্থ ৫৯ মিটার এবং গভীরতা ১০ মিটার। খালটি অতিক্রমণ সময় প্রায় ১০-১২ ঘন্টা এবং প্রতিদিন প্রায় গড়ে ৪৫টি জাহাজ চলাচল করে থাকে। খাল খননের পূর্বে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ হতে উত্তমাশা অন্ত রীপ পথে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করে তো।

মিশরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বলে এ খালটি মিশর সরকারের এবং ১৯৬৭-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষের পরবর্তীকাল থেকে সুয়েজ ক্যানেল অথরিটি নামক একটি সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। সুয়েজ খালের পশ্চিমে আফ্রিকা, পূর্বে এশিয়া মহাদেশ অবস্থিত হলেও বর্তমানে ইউরোপ ও এশিয়ার সঙ্গে মূলতঃ অবাধ বাণিজ্যে সুবিধা ভোগ করছে। এ খাল পথ দুরত্ব হ্রাস করে দূরকে করেছে অতি নিকটে, যেমন- লন্ডন হতে করাচী ৭২০০ কি মি পথ, লন্ডন থেকে ইয়াকোহামা ৪৮০০ কি মি; লন্ডন ও সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ৫৩০০ কি মি, লন্ডন থেকে বোম্বাই পর্যন্ত ৭০০০ কিমি, লন্ডন ও কলিকাতা পর্যন্ত ৫৬০০ কিমি, লন্ডন ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত ৪৬৪৮ কিমি এবং লন্ডন ও সিডনি পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় ১০০০ কি মি হ্রাস করেছে। অর্থাৎ এ খাল পথটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রায় ৭৫০০ কিমি পথ হ্রাস করেছে।

এ খাল পথের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত দেশগুলো অতি ঘনবসতিপূর্ণ কিন্তু কৃষিজ, খনিজ ও শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধশালী। ফলে স্বাভাবিক কারণেই নিজেদের মধ্যে প্রচুর পণ্য সামগ্রী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তথা আমদানী ও রপ্তানী ক্রিয়াকর্মে সর্বদাই সক্রিয় ও ব্যস্ততার মধ্যে থাকে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এপথের প্রভাব ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুয়েজ খাল খনন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য উন্মোচন এক অভূতপুর্ব পরিবর্তন সাধনকারী ঘটনা যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে বিপুল সাড়া জাগিয়ে তুলেছে।

নিম্নে এ পথের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বের কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলোঃ

ক) বাণিজ্যিক পণ্যসামগ্রী বিনিময় ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এ পথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশসমূহের মধ্যে অতি ঘনিষ্ট যোগসূত্র স্থাপন করেছে। এ খাল পথ দিয়ে পাশ্চাত্যের দেশসমূহ হতে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, মধ্য প্রাচ্য হতে খনিজ তৈল ও তৈলজাত দ্রব্যাদি, প্রাচ্যের দেশসমূহ হতে বিভিন্ন কৃষিজ, বনজ, খনিজ ও শিল্পের কাঁচামাল জাতীয় পণ্যসামগ্রী পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সরবরাহ ও যে কোন আমদানী তথা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত

হয়েছে। বলতে গেলে পৃথিবীর প্রায় ২০ ভাগ সামুদ্রিক বাণিজ্যিক পণ্য সামগ্রী এই খাল পথ দিয়ে পরিবাহিত হয়ে থাকে। প্রায় বছরে আনুমানিক ১৫/১৬ হাজার জাহাজ ৩ কোটি টনেরও বেশি মালামাল এ পথ দিয়ে পরিবাহিত হয়।

খ) জাহাজ চলাচল সময় ও দূরত্ব হ্রাস ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুয়েজ খাল খনন এবং এ পথকে সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করণের ফলে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বন্দরসমূহ এবং মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশের অন্যান্য বন্দরের মধ্যে এ পথ অতিক্রমকারী বিভিন্ন মালবাহী জাহাজগুলোর গড় দূরত্ব অনেক হ্রাস পেয়েছে। সময়ের দীর্ঘতা কমিয়ে এসেছে এবং ফলে জাহাজ ভাড়া তথা মালামালের মাশুল অনেকাংশে কম পড়ে থাকে।

গ) বিখ্যাত বন্দর সান্নিধ্য ও জ্বালানীর সহজলভ্যতায় ঃ যেহেতু বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী সহ অনেক সাধারণ যাত্রী উভয়মুখী পথে পরিবাহিত হয়ে থাকে, সেহেতু এসব দেশের প্রখ্যাত বড় বড় ধরনের বন্দর (যাদের রয়েছে মালপত্র খালাসের সুবিধাসহ যেমন- করাচী, কলিকাতা, বোম্বাই, এডেন, পোর্ট সৈয়দ,আলেকজান্দ্রিয়া, ওডেসা, জেনোরা, মার্শাই, রডারডাম, লিভারপুল, লন্ডন প্রমুখ যাদের সুনাম অতীত থেকে আজ অবধি বিদ্যমান থাকায় অনেক জাহাজ এ পথকে বেছে নেয়। তদুপরি এ পথের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত দেশগুলো থেকে প্রয়োজনীয় জ্বালানী (যেমন- ইউরোপ থেকে কয়লা এবং মধ্যপ্রাচ্য ও মিশর, ইরান থেকে খনিজ তৈল) অনায়াসে নেয়ার সুবিধার কারণে অনেক জাহাজ এ পথকে বেছে নেয়।

ঘ) প্রাকৃতিক কারণ ঃ স্বাভাবিকভাবে দূরত্ব হ্রাস সময়ের স্বল্পতা এবং বিশেষ করে প্রাকৃতিক ভাবেই এ পথে ঝড় ও তুফানের মত উৎপাত নানা ধরনের থাকায় অনেকেই এ পথকে বেশি পছন্দ করে থাকে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুয়েজ খালের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. সমুদ্র পথের মাধ্যমে ____ বাণিজ্য সংঘটিত হয়ে থাকে, তাই একে _______ বাণিজ্য পথ _____ হয়ে থাকে।

২. বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে এখন ________, _______ সদৃশ্য _________ সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় পৃথিবীর ________ দেশের রকমের _____________ সামগ্রীর ________ ঘটে ___________ পথকে ঘিরে আর _________ থেকে বিস্তীর্ণ স্থানে ___________ প্রক্রিয়া সহজরূপে প্রকাশিত হতে থাকে।

৩. তুলনামূলক __________ শ্লথ ___________ কারণে _________ বাবদ খরচ কম হয় অপর পক্ষে স্থল __________ গতিবেগ বেশি হয় ____________ খরচে।

৪. উত্তর আমেরিকার _____ বন্দরসমূহ হতে __________ বন্দরগুলোর _____________ পথ।

৫. যাত্রী চলাচল একটি ___________ ঘটনা।

৬. এ সমুদ্র পথের _______ধারে বহু ________উপকূল ও _______ উপস্থিতি _______ সাহায্য করেছে।

৭. ইহা প্রায় ____________ মাইল দীর্ঘ।

৮. পথটি অনেক _________ সঙ্গে সংযুক্ত বিধায় ________ বহু যাত্রী দ্রুততর _________ ও _____সরবরাহ সম্ভব।

৯. ____ কর্তৃক এ পথটি __________ পূর্বে এ পথই ____ প্রাচ্য ও ________ মধ্যে যাতায়াত ___ ছিল।

১০. ____ মাধ্যমে ________ উভয় অংশের কূল তীরবর্তী _________ অস্ট্রেলিয়া, চীন __________ ইত্যাদি।

উত্তর ঃ

১. সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক, আন্তর্জাতিক, বলা
২. বিশাল, জালিকা, সমুদ্রপথের, বিভিন্ন, বিচিত্র, উৎপন্ন, সমাবেশ, সাগর, যেখান, বিস্তরণ
৩. জলপথ, গতির, জ্বালানী, পরিবহণ, অনুরূপ
৪. পূর্বাংশের, পশ্চিম ইউরোপের, মধ্যে, সংযোগস্থাপনকারী
৫. ঋতুভিত্তিক
৬. উভয়, ভগ্ন, খাড়ির, স্বাভাবিকভাবে
৭. ৪৩০০
৮. বন্দরের, মালামালসহ, সময়ে, নিরাপদে

৯. ভাস্কোডাগামা, আবিস্কারের, একমাত্র, প্রতীচ্যের, মাধ্যম
১০. পানামা, খালের, আমেরিকার, অঞ্চল, সহ, জাপান

সঠিক বাক্যের পার্শ্বে টিক চিহ্ন এবং ভুল বাক্যের পার্শ্বে ক্রস চিহ্ন দিন।

১. জলপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে সমুদ্র পথ। উঃ √
২. বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র এখন বিশাল জালিকা সদৃশ্য সমুদ্রপথের সঙ্গে সংযুক্ত। উঃ √
৩. স্থল পথের ন্যায় সমুদ্র পথ নির্মাণ করতে হয় না। উঃ √
৪. সমুদ্র পথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বাঁধা নিষেধ থাকে না। উঃ √
৫. সমুদ্র পথ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিনিময়ের মাধ্যম। উঃ √
৬. উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথে শিল্পজাত দ্রব্যাদির চলাচল কাঁচামাল ও খাদ্যের তুলনায় বরং বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উঃ √
৭. যাত্রীবাহিত জাহাজগুলো সাধারণত ডাক ও স্বল্প পরিমাণ বেশি মূল্যের পণ্য সামগ্রী বহণ করে থাকে। উঃ √
৮. দক্ষিণ আটলান্টিক সমুদ্র পথ পূর্ব পশ্চিমের চেয়ে উত্তর দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। উঃ √
৯. দ্বিতীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্র পথের একটি অংশ পশ্চিমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যাত্রা করে হাওয়াই দ্বীপ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। উঃ √
১০. উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী প্রায় ৬০০ কি মি দীর্ঘ কিন্তু সংকীর্ন পানামা যোজক বিদ্যমান। উঃ √
১১. সমুদ্র পথ হিসেবে পৃথিবীর বুকে উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথের ব্যাপক পরিচিতি বিদ্যমান। উত্তরঃ √
১২. যাত্রী ও পণ্যসামগ্রী পরিবহণে উত্তর আটলান্টিক পথের সমকক্ষ আর কোন নেই। উত্তরঃ √
১৩. উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথকে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম বাণিজ্য পথ বলা হয়। উত্তরঃ √

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পরিবহণ কি? ইহা কত প্রকার?
২. পরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্ব উল্লেখ করুন।
৩. সমুদ্র পথের সুবিধাদি উল্লেখ করুন।
৪. উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথ কোন কোন দেশের বাণিজ্য অবাধে চলে?
৫. উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথের গুরুত্বের ৩টি বিষয় উল্লেখ করুন।
৬. পানামা খালে পথের বিবরণ লিখুন।
৭. উত্তমাশা অন্তরীপ পথের বিবরণ লিখুন।
৮. উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথে তীরবর্তী দেশগুলোর নাম লিখুন।
৯. উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথ সবচেয়ে ব্যস্ততম কেন?
১০. উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথের উল্লেখযোগ্য বন্দরগুলোর নাম লিখুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২. বিভিন্ন প্রকার পরিবহণ ব্যবস্থা আলোচনা করুন।
৩. পরিবহণ মাধ্যম হিসেবে সমুদ্রপথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
৪. পরিবহণ ব্যবস্থায় উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৫. উত্তর আটলান্টিক সমূদ্র পথের বিবরণ দিন।
৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র পথের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

পাঠ-৭.২ ঃ বিশ্বের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বন্দর, অবস্থান, গুরুত্ব ও মালামাল পরিবহণের ধরণ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ বন্দ গড়ে ওঠার অনুকুল অবস্থা বলতে পারবেন;
- ☞ বিশ্বের বিভিন্ন বন্দর ও তাদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- ☞ বন্দরে মালামাল পরিবহণ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

বন্দর গড়ে উঠার অনুকুল অবস্থা

বন্দর ঃ যে সকল স্থান থেকে আমদানী-রপ্তানীর নিমিত্তে বিভিন্ন প্রকারের পণ্য সামগ্রী নৌকা, গাড়ী, জাহাজ ইত্যাদি যানবাহনে নামানো ও উঠানোসহ প্রেরণ করা হয় তাদেরকেই বন্দর নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে বন্দর বলতে নৌপথ ও স্থলপথের সংযোগ স্থলকে বলে থাকেন। ইহা দেশের বহিঃ বাণিজ্যের উন্মুক্ত দ্বার এবং দেশের ভিতরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে জলে, স্থলে, রেলপথের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। এক কথায় বন্দর হচ্ছে, আমদানী-রপ্তানী তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবেশ দ্বার। এখানে রয়েছে যাত্রী, বিভিন্ন ধরনের জাহাজ ও মালামালের নিরাপত্তাসহ উঠানামা মেরামত জ্বালানী সরবরাহ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম, অবস্থান, বাণিজ্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বন্দর, যেমন নদী বন্দর, সমুদ্র বন্দর, গুদাম বন্দর ইত্যাদি হতে পারে। তবে বেশীর ভাগ দেশে দুই ধরনের বন্দর (নদী ও সমুদ্র) দেখতে পাওয়া যায় এবং এগুলো নানাবিধ কারণে গড়ে উঠে থাকে। নিম্নে অনুকূল অবস্থাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া গেল।

ক) ভৌগোলিক কারণ ঃ এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ভূমিকা পালন করে থাকে। ভৌগোলিক কারণের মধ্যে উত্তম পোতাশ্রয় (যাতে বিভিন্ন ধরনের জাহাজসমূহ বিপদে আশ্রয়, বিশ্রাম ইত্যাদি), ভগ্ন তটরেখা যা সাধারণতঃ বহুগভীর ও প্রশস্ত এবং যাতে অনেক জাহাজ আশ্রয় নিয়ে অবস্থান করতে পারে), মগ্নচড়া বা শৈলমুক্ততা (যার উপস্থিতি জাহাজ চলাচলের জন্য বিপদ/ঝুকিপূর্ন), বেশ গভীরতা বিশিষ্ট উপকূল রেখা, সুবিশাল সমভূমি (যাতে জাহাজ মেরামত ও জেটি নির্মাণ, গুদামঘর, শিল্প কারখানা, আবাসিক এলাকা নির্মাণ ইত্যাদি করা যায়), কাম্য অনুকূল জলবায়ু (যেমন-বরফ ও কুয়াশা মুক্ত এলাকা, বৃষ্টির আধিক্যতা নেই, জাহাজ চলাচলসহ মালামাল উঠানামার কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে, স্বাস্থ্যকর অবস্থা ইত্যাদি সর্বদা বিরাজমান থাকে) এবং সমৃদ্ধ আদর্শ পশ্চাদভূমি (জনবহুল ও উন্নত সমৃদ্ধশালী এবং কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও চাহিদা, যাতে আমদানী রপ্তানী প্রক্রিয়া সক্রিয়মান বজায় থাকে) ইত্যাদির কারণে বন্দর গড়ে উঠে।

খ) অন্যান্য কারণের মধ্যে অনুকূল শুল্ক বা কর ব্যবস্থা নীতি ঃ অতিরিক্ত শুল্ক বা করারোপ এড়িয়ে সুষম শুল্ক নীতি গ্রহণ, উন্নত যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যবস্থা (যাত্রীসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রী উঠানো এবং নামানোসহ বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগের ব্যবস্থা), জ্বালানীর ব্যবস্থা (দুর পাল্লার জাহাজসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের জ্বালানীর সুবন্দোবস্ত থাকা অপরিহার্য)। সুপেয় খাবার পানি, সুবিশাল ও স্বাস্থ্য প্রদ গুদামঘর, কুলি মজুরসহ বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মচারী, কর্মকর্তাদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি আদর্শ বন্দর গঠনের জন্য অপরিহার্য অংশ।

বিশ্বের বিভিন্ন বন্দর

এশিয়া মহাদেশঃ এশিয়া মহাদেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর বিদ্যমান এবং নিম্নে তার কয়েকটি বন্দরের বর্ণনা দেয়া হলোঃ

ক) চট্টগ্রাম ঃ কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত বাংলাদেশের বৃহত্তম সামুদ্রিক বন্দর যার প্রায় সমগ্র বাংলাদেশই পশ্চাৎভূমি। বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থা, যেমন রেল, সড়ক ও বিমান পথের মাধ্যমে দেশের রাজধানীসহ অন্যান্য অংশের সহিত বন্দরটির সুন্দর সংযোগ রয়েছে। বলতে গেলে এ বন্দর দিয়েই বাংলাদেশের সকল প্রকার আমদানী ও রপ্তানী প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে থাকে এবং এর সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে উন্নত যোগাযোগ বিদ্যমান। এ বন্দর দিয়ে বাংলাদেশের উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিজপণ্য যেমন পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক, চা, চিংড়ী, চামড়া ইত্যাদি রপ্তানী এবং ঔষধপত্র, কয়লা, তৈল, টিনজাত খাদ্য সামগ্রী, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানী হয়ে থাকে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিমান বন্দরও এখানে অবস্থিত।

খ) কোলকাতা ঃ ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত বন্দরটি ভারতের বৃহত্তম বন্দর ও নগর এবং সমগ্র পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ইত্যাদি কোলকাতা বন্দরের পশ্চাৎভূমি। পশ্চাৎভূমি সহ ভারতের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে এ বন্দরের সড়ক, রেল ও বিমান পথে উন্নত যোগাযোগ রয়েছে এবং ভারতের নানা ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান এ বন্দরের উপকণ্ঠে গড়ে উঠেছে। এ বন্দর দিয়ে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, নানা প্রকারের খনিজ দ্রব্য (লৌহ ও ইস্পাত,

কয়লা অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ) টাটা নির্মিত বিভিন্ন যানবাহন ইত্যাদি রপ্তানী এবং রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি আমদানী হয়ে থাকে। বিমান বন্দর হিসেবে বিশ্বে এর ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। কোলকাতা পোতাশ্রয়টি কৃত্রিম।

গ) করাচী ঃ আরব সাগর তীরস্থ অবস্থিত পাকিস্তানের বৃহত্তম বন্দর যার পশ্চাৎভূমি সমগ্র পাকিস্তান। পাকিস্তানে উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্য যেমন, গম, তুলা, তৈলবীজ, চামড়া, ও বিভিন্ন কাচামাল ইত্যাদি রপ্তানী এবং খনিজ তৈল, বস্ত্র, খেলার সরঞ্জাম, লৌহ, ইত্যাদি আমদানী এ বন্দর মারফত আদান প্রদান হয়ে থাকে। এর পোতাশ্রয়টি স্বাভাবিক এবং বিমান বন্দর হিসেবেও বিশ্বে এর ব্যাপক পরিচিতি বিদ্যমান।

ঘ) মোম্বাই ঃ ভারতের অন্যতম বৃহত্তম সামুদ্রিক বন্দর ও নগর যা আরব সাগর তীরস্থ পশ্চিম ভারতীয় রাজ্য মহারাষ্ট্রের রাজধানী। এটিতে পৃথিবীর বৃহত্তম স্বাভাবিক পোতাশ্রয় রয়েছে এবং এতে পর্যাপ্ত গভীরতা এবং অতিরিক্ত প্রাকৃতিক নিরাপত্তা বিদ্যমান। রেলপথ, সড়কপথ ও বিমান পথে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে উন্নত যোগাযোগ রয়েছে। অনেক শিল্প কারখানা এর চতুর্দিকে গড়ে উঠেছে যা বন্দরটিকে সর্বদাই ব্যস্ত রাখে।

ঙ) মাদ্রাজ ঃ ভারতের পুর্ব উপকূলে অবস্থিত দেশের ৩য় বৃহত্তম বন্দর। ভারতের উৎপাদিত কৃষিজদ্রব্য যেমন চীনাবাদাম, তামাক, চা, চামড়া, খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি রপ্তানী দ্রব্যাদি এবং কাঠ, কয়লা, চিনি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, কাগজ ইত্যাদি আমদানী দ্রব্যাদি, এ বন্দর দিয়ে চলাচল করে থাকে। এখানকার পোতাশ্রয়টি কৃত্রিম।

চ) কলম্বো ঃ দক্ষিণ ভারতের সন্নিকটে শ্রীলংকা যা সার্কের অন্যতম সদস্য বঙ্গোপসাগরস্থ দ্বীপভূমি অন্তর্গত দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত দেশের বৃহত্তম সামুদ্রিক বন্দর, রাজধানী ও আড়তদারী কেন্দ্র। সমগ্র শ্রীলংকাই এর পশ্চাৎভূমি এবং এবন্দর দিয়ে নারিকেল ও তেল, রবার, চা, চিনি প্রভৃতি রপ্তানী দ্রব্য এবং খনিজ তৈল, চিনি বস্ত্র ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানী দ্রব্য চলাচল করে থাকে।

ছ) আকিয়াব ঃ ইহা মায়ানমারের পশ্চিম উপকূলস্থ এক মাত্র বন্দর, তবে পশ্চাৎভূমি অনুন্নত হওয়ার কারণে বাণিজ্যের দিক দিয়ে তত উন্নত নয়। মায়ানমারের উৎপাদিত ধান, চাল ও কাষ্ঠ প্রধান রপ্তানী দ্রব্য এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রধান আমদানী দ্রব্য যা এ বন্দরের মারফতই হয়ে থাকে।

জ) রেঙ্গুন ঃ ইরাবতী নদী তীরস্থ মায়ানমারের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। এটি এদেশের প্রধান শিল্প নগরী এবং সমগ্র ইরাবতী নদী উপত্যকাই এর পশ্চাৎভূমি। যার ফলে এর সঙ্গে অন্যান্য এলাকার জলপথ ও স্থলপথের সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ বন্দর দিয়ে চাল, কাঠ, খনিজ তেল ইত্যাদি রপ্তানী এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য, বিলাস সামগ্রী সহ নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানী হয়ে থাকে।

ঝ) ইয়াকোহোমা ঃ হনসু দ্বীপে অবস্থিত জাপানের প্রধান বন্দর এবং এর রয়েছে বিশাল ও সুগভীর পোতাশ্রয়। সমগ্র হনসু দ্বীপই এর পশ্চাৎভূমি। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য, বিভিন্ন হালকা থেকে ভারী ধরনেরর যানবাহন ও তার যন্ত্রপাতি, আধুনিক সকল ধরনের ইলেক্ট্রনিকস বিলাস সামগ্রী রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যাদি, চা ও চাল ইত্যাদি রপ্তানী দ্রব্য এবং কার্পাস, চিনি, বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল এ বন্দরের মাধ্যমে চলাচল করে।

ঞ) সাংহাই ঃ চীনের ইয়াংসি নদীর মোহনায় অবস্থিত বিখ্যাত বন্দর, শহর ও শিল্প কেন্দ্র এবং একে কেন্দ্র করেই চীনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয়ে থাকে। নানাবিধ কৃষিজ পণ্য যেমন- চাল, চা, তামাক, রেশম, তুলা ও তুলাজাত দ্রব্যসামগ্রী, সয়াবিন, আফিম ও অনেক ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি ইত্যাদি রপ্তানী এবং রাসায়নিক দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত, কেরোসিন তৈল, ইত্যাদি আমদানী দ্রব্যাদি এ বন্দরের মারফত হয়ে থাকে।

ট) হংকং ঃ বর্তমানে চীন নিয়ন্ত্রিত সিকিয়াং নদীর তীরে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম বন্দরগুলোর অন্যতম হংকং চীনের প্রাণকেন্দ্র এবং বলতে গেলে সমগ্র দক্ষিণ চীনেই এর পশ্চাদভূমি। চা, চিনি, তুলা, চাল, ধাতব পদার্থ ইত্যাদি রপ্তানী দ্রব্য এবং তৈলবীজ, রাসায়নিক দ্রব্য ও বস্ত্র ইত্যাদি আমদানী দ্রব্য এ বন্দর মারফত হয়ে থাকে।

ঠ) সিঙ্গাপুর ঃ দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার প্রধান আড়তধারী বন্দর সিঙ্গাপুর যা মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত। পৃথিবীর প্রায় সব ধরনের এবং সর্বমুখী জাহাজগুলোর সবাইকে এ বন্দরে পূর্ণ জ্বালানী নিতে হয়। ফলে এর গুরুত্ব সর্বাধিক। এ বন্দর মারফত রবার, মসলা, সিনকোনা, টিন, প্রভৃতি রপ্তানী এবং বস্ত্র, খনিজ তেল ও লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রী আমদানী দ্রব্য চলাচল করে থাকে।

ড) ম্যানিলা ঃ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী শহর ও বিখ্যাত প্রধান বন্দর, যার রয়েছে কৃত্রিম পোতাশ্রয় এবং সমগ্র ফিলিপাইন দ্বীপ ভূমিই এর পশ্চাৎভূমি। নারিকেল তেল ও শাস, তামাক ইত্যাদি রপ্তানী দ্রব্য এবং কাপড় চোপড়, রেশম বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত ইত্যাদি আমদানী দ্রব্য এর মাধ্যমে চলাচল করে থাকে।

ঢ) ব্যাংকক ঃ মেনাম নদীর তীরে অবস্থিত ব্যাংকক থাইল্যান্ডের প্রধান বন্দর ও শহর এবং সমস্ত থাইল্যান্ডই এর পশ্চাৎভূমি। এ দেশে উৎপাদিত বিশেষ করে কৃষিজ পণ্য যেমন ধান, কাঠ, টিন ইত্যাদি রপ্তানী এবং কার্পাস বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত ইত্যাদি দ্রব্যাদি আমদানী এ বন্দর মাধ্যমে চলাচল হয়ে থাকে।

ন) সায়গন ঃ ভিয়েতনামের প্রধান বাণিজ্য বন্দর এবং সমস্ত ভিয়েতনামই এর পশ্চাৎভূমি। চাল, তুলা, নারিকেল ও তার শাঁস, মসলা ইত্যাদি রপ্তানী এবং কাপড়, রেশম বস্ত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানী দ্রব্য এ বন্দর মারফত চলাচল করে থাকে।

ত) এডেন ঃ আরবের দক্ষিণে অবস্থিত একটি বৃহৎ বিমান ঘাটি ও প্রধান বন্দর। উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা ও পশ্চিম ইউরোপগামী সমস্ত জাহাজই এ বন্দর অতিক্রম করে থাকে। কফি, লবন এ বন্দরের মাধ্যমে আমদানী রপ্তানী হয়ে থাকে।

থ) বৈরুত ঃ লেবাননের প্রখ্যাত বিমান বন্দর ও রাজধানী শহর। রেলপথ ও সড়কপথে এর সঙ্গে সংযোগ রয়েছে।

আফ্রিকা মহাদেশ

১) আলেকজান্দ্রিয়া ঃ আলেকজান্দ্রিয়া মিশরের সর্ববৃহৎ বন্দর। ইহা ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ নীল বদ্বীপ ভূমির উত্তর পশ্চিমে সুয়েজখালের সন্নিকটে অবস্থিত যার পশ্চাৎভূমি সমগ্র মিশর। তুলা, চিনি, চাল, ফল রপ্তানী এবং নানাবিধ শিল্প সামগ্রী ও যন্ত্রপাতিসহ কাঠ, গম ইত্যাদি আমদানী এর মারফত হয়ে থাকে।

২) পোর্ট সৈয়দ ঃ ইহা সুয়েজ খালের উত্তর তীরে অবস্থিত মিশরের দ্বিতীয় বৃহত্তম সামুদ্রিক বন্দর। সমুদ্রগামী জাহাজগুলো এখান থেকে পুনঃ জ্বালানী নিয়ে থাকে। অনেকে ইহাকে প্রাচ্যের আড়তদারী বন্দর হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

৩) পোর্ট সুদান ঃ সুদানের অন্যতম প্রধান বন্দর যা লোহিত সাগর তটে অবস্থিত। তুলা প্রধানতঃ রপ্তানী এবং রাসায়নিক দ্রব্য, খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদি আমদানী দ্রব্য এ বন্দর দিয়ে চলাচল করে থাকে।

৪) ডারবান ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল প্রদেশের পূর্ব উপকূলস্থ প্রধান বন্দর যার রয়েছে উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়, কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ পশ্চাৎভূমি এবং রেলপথ ও সড়ক পথের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে। এ বন্দর দিয়ে সোনা, তামা, কয়লা, গম, চাল ইত্যাদি রপ্তানী এবং খাদ্য দ্রব্য, ফলমূল, বিলাস সামগ্রী ইত্যাদি আমদানী কার্য সমাধা হয়।

৫) কেপটাউন ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দর এবং এর সুন্দর পোতাশ্রয় রয়েছে। এ বন্দর দিয়ে নানান কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্য আমদানী রপ্তানী প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে।

ইউরোপ মহাদেশ

১) লন্ডন ঃ ইংল্যান্ডের টেমস নদীর তীরে অবস্থিত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প ও বাণিজ্য শহর এবং বৃহত্তম বন্দর। যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ-পুর্বাংশের ঘন বসতিপূর্ণ শিল্প প্রধান অঞ্চল এ বন্দরের পশ্চাৎভূমি। এ বন্দর দিয়ে দেশের রপ্তানী প্রায় ২৫% আমদানী প্রায় ৪০% অর্থাৎ দেশের এক তৃতীয়াংশ মালামাল যেমন চা, মাংস, তামাক, চামড়া, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, দুগধজাত দ্রব্যাদি আমদানী এবং কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি যন্ত্রপাতি যানবাহন ইত্যাদি রপ্তানী সামগ্রী নিয়ে জাহাজ চলাচল করে থাকে।

২) লিভারপুল ঃ ইংল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলস্থ মার্স নদীর মোহনায় অবস্থিত অন্যতম প্রধান বন্দর। শায়ার অধ্যুষিত (যেমন দক্ষিণ লাংকাশার, ইয়র্কশায়র স্ট্যাফোর্ড রায় (চ-শায় প্রমুখ) অঞ্চলগুলো এ বন্দরের পশ্চাৎভূমি। তুলা, গম প্রভৃতি আমদানী দ্রব্য এবং সূতী বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি রপ্তানী দ্রব্য এ বন্দর দিয়ে চলাচলে করে থাকে।

৩) গ্লাসগো ঃ ক্লাইভ নদীর তীরে অবস্থিত স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত বন্দর। স্কটল্যান্ডের প্রসিদ্ধ খনিজ দ্রব্য সমূহ জনবহুল এলাকা এর পশ্চাদভূমি। এ বন্দর মারফত রাসায়নিক দ্রব্য, সূতীবস্ত্র, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত জাতীয় দ্রব্যাদির রপ্তানী কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৪) ব্রিস্টল ঃ শ্যাভন নদীর মোহনায় অবস্থিত ইংল্যান্ডের একটি প্রখ্যাত পুরাতন বন্দর। এটি কয়লার খনি ও সিগারেটের জন্য প্রখ্যাত এবং এসব দ্রব্যাদি এ বন্দর মারফত চলাচল করে থাকে।

৫) জেনোয়া ঃ ইতালীর জেনোয়া উপসাগরের তীরস্থ অবস্থিত এ বন্দরটি দিয়ে কফি, কোকো, চা, চিনি, ইত্যাদি আমদানী দ্রব্য এবং কার্পাস, জলপাই, ফলমূল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি রপ্তানী দ্রব্যাদির আদান প্রদান হয়ে থাকে।

৬) হামবুর্গ ঃ জার্মানীর (পশ্চিম) এলব নদীর মোহনায় অবস্থিত বিখ্যাত আড়তদারী বন্দর। লবণ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, নানা প্রকার শিল্প সামগ্রী (জাহাজসহ), রপ্তানী এবং তুলা, চিনি, কয়লা, ইত্যাদি আমদানী দ্রব্য এ বন্দর মারফত যাতায়াত করে থাকে।

৭) কার্ডিক ঃ ওয়েলসের প্রধান বন্দর। এ বন্দর দিয়ে খাদ্যশস্য আমদনী দ্রব্য এবং লৌহ ইস্পাত, কয়লা, কার্পেট ইত্যাদি রপ্তানী হয়ে থাকে।

৮) ডানজিক ঃ বাল্টিক সাগরের তীরস্থ পোল্যান্ডের প্রধান বন্দর এবং বলতে গেলে সমগ্র পোল্যান্ডই এর পশ্চাৎভূমি এ বন্দর দিয়ে কাষ্টমন্ড ও মন্ড, কয়লা ইত্যাদি রপ্তানী ও খাদ্যশস্য, আলু ইত্যাদি আমদানী দ্রব্য চলাচল করে।

৯) জিব্রালটার ঃ আটলান্টিক মহাসাগরের প্রবেশ মুখে ভূমধ্যসাগরস্থ পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত স্পেনের প্রধান বন্দর, যার রয়েছে উৎকৃষ্ট ধরনের সুরক্ষিত পোতাশ্রয়। অনেকের মতে এটি একটি আড়তদারী বন্দর এবং বলতে গেলে সব ধরনের জাহাজ এ বন্দরে বাবহৃত হয়।

১০) মার্সেলস ঃ ফ্রান্সের প্রধান বন্দর, রোন নদীর তীরে অবস্থিত এবং সমস্ত রোন উপত্যকাই এর পশ্চাৎভূমি। আমদানী দ্রব্য যেমন- তৈলবীজ, চিনি, পাট প্রভৃতি এবং রপ্তানী দ্রব্য যেমন- ভূমধ্যসাগরীয় ফলমূল, এ বন্দর মাফরত চলাচল করে থাকে।

১১) ইস্তাম্বুল ঃ পূর্বের কনস্ট্যান্টনোপল বর্তমানের ইস্তাম্বুল তুরস্কের সর্ববৃহৎ বন্দর এবং এটি ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগর বেষ্টিত বসফোরাস প্রণালীর মধ্যস্থ সবচেয়ে নিরাপদমূলক বন্দর। ফলমূল, তুলস ইত্যাদি রপ্তানী এবং খাদ্য দ্রব্য, বস্ত্র ইত্যাদি আমদানী দ্রব্য এ বন্দর দিয়েই যাতায়াত করে থাকে।

১২) লেনিন গ্র্যাড ঃ প্রসিদ্ধ বন্দর এবং বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত রাশিয়া। এটি বৎসরের অর্ধেক সময় বরফাচ্ছন্ন থাকে বলে উন্নত মানের বন্দর নয় এবং বাল্টিক সাগর তীরবর্তী অঞ্চলই এর পশ্চাৎভূমি। এ বন্দর দিয়ে রাশিয়ার রপ্তানী দ্রব্য যেমন- বস্ত্র, কাগজ, চামড়া, ইত্যাদি এবং আমদানী দ্রব্য যেমন- গম, তুলা ইত্যাদি যাতায়াত করে থাকে।

উত্তর আমেরিকা

১) নিউইয়ক ঃ আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলস্থ হাডসন নদীর মোহনায় ম্যানহাটান দ্বীপে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ নগর ও বন্দর। অনেকে এ বন্দরকে বাণিজ্যের কারণে ইউরোপের সিংহ দ্বার হিসেবে অভিহিত করে থাকেন এবং বলতে গেলে জল, স্থল সড়ক ইত্যাদি পথে অন্যান্য অংশের সঙ্গে উন্নত যোগাযোগ রয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ শিল্প সমৃদ্ধ শালী এলাকা এর পশ্চাদভূমি। এ বন্দর মারফত খাদ্যশস্য, কাঁচামাল ইত্যাদি রপ্তানী দ্রব্য এবং চা, চিনি, চামড়া ইত্যাদি আমদানী দ্রব্য চলাচল করে থাকে।

২) বোস্টন ঃ নিউ ইংল্যান্ড রাজ্যের প্রধান বন্দর ও পোতাশ্রয় যা আটলান্টিক মহাসাগরীয় উপকূলে অবস্থিত এবং যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্ব শিল্পকেন্দ্র এর পশ্চাদভূমি। এ বন্দর দিয়ে বস্ত্র, পশম, মাংস ইত্যাদি পারাপার হয়ে থাকে।

৩) সানফ্রান্সিসকো ঃ ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান বন্দর এবং ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যটির সমস্ত ভূ-ভাগই এর পশ্চাদভূমি। গম, ফল, খনিজ তৈল প্রভৃতি রপ্তানী এবং শিল্পজাত দ্রব্য, চা ও চিনি ইত্যাদি আমদানী দ্রব্য এ বন্দর দিয়ে চলাচল করে।

এ ছাড়া শিকাগো, লস এঞ্জেলস, পিটসবার্গ, নিউ অরলিন, হ্যালিফাক্স হনলুলু, মন্ট্রিল ফিলাডেল ফিয়া ইতাাদি উল্লেখযোগ্য বন্দর রয়েছে।

পাঠ- ৭.৩ ঃ পরিবহণ ব্যবস্থা ঃ বিমান পথ

এই পাঠ শেষে আপনি—
- ☞ বিমান পথ কি তা বলতে পারবেন;
- ☞ বিমান পথের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
- ☞ উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক বিমান পথসমূহ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

৭.২.১ বিমান পথ ঃ আকাশ বা শূণ্য পথে বিমান, হেলিকপ্টার, জেট বিমান ইত্যাদির মাধ্যমে পৃথিবীর এক দেশ থেকে অন্য দেশে অথবা এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ভ্রমণ বা ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানোই বিমান পথ নামে অভিহিত। আজ পর্যন্ত এটিই পৃথিবীর দ্রুততম পরিবহণ ব্যবস্থা এবং যে কোন আবহাওয়ায় পাড়ি জমাতে সক্ষম। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিমান পথের বিকাশ লাভ বিংশ শতাব্দীর এক গুরুত্বপূর্ণ বিস্ময়কর ঘটনা আর এর যাত্রা শুরু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যাহত পরে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের বেসামরিক পর্যায়ে এবং আজ অবধি এর যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা বড় ব্যয় বহুল যা ভর্তুকী ছাড়া বিশেষ করে অনুন্নত দেশসহ অনেক পাশ্চাত্যের দেশের পক্ষে এ পথ অব্যাহত রাখা বড় সুকঠিন হয়ে পড়েছে। তদুপরি বর্তমানের নানান ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, ট্রেড ইউনিয়ন সহ নানান ধরনের প্রতিকূল হুমকী এ পরিবহণ ব্যবস্থা আজ বিরাট সমসার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

৭.২.২ বৈশিষ্ট্যাবলী

১. বিমান পথে ভ্রমণ বেশ ব্যয়বহুল। তাই মুনাফাসহ এ পরিবহণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে গেলে সেখানকার পরিচর্যামূলক কার্যাদির সক্রিয়তাসহ বেশি সংখ্যক যাত্রী ও তাদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও তা ভোগ করার উপযোগ্য পরিবেশ বজায় রাখা।

২. এ পথকে সচল রাখতে গেলে জ্বালানী ব্যয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যে কোন পরিবহণ ব্যবস্থার তুলনায় বিমান পথের জ্বালানী ব্যয় বেশি।

৩. বিমানকে সর্বোচ্চ ও সর্বদা কার্যক্রম রাখতে গেলে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভিত্তিতে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ও কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। যদি কোন বিমান যে কোন ভাবেই দোষমুক্ত না হয় তবে ইহা যে কোন মুহূর্তে নানান গোলযোগ এমন কি ধ্বংস সাধনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

৪. বিমান চলাকালীন আবহাওয়ার অবস্থার বিশেষ করে প্রবলবেগে বাতাসের প্রবাহসহ ঝড়ো হাওয়া, অবিরাম বর্ষণ, বর্জপাতসহ মেঘাচ্ছন্নতা, কুয়াশা, বৃষ্টিপাতের ধরনের উষ্ণতার তারতম্য ইত্যাদি উপাদানের অনবরত পরিবর্তনে বিশেষ সাবধানতাসহ সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বর্তমান সময়ে প্রতিটি বিমানেই রেডিও ও রাডার সংযুক্ত থাকে বিধায় বেশ ব্যয় বহুল।

৫. বিমান বন্দর, টার্মিনাল নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদিও বেশ ব্যয়সাধ্য এবং এগুলোর জন্য বিশাল সমতল জাতীয় ভূ-ভাগের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

৬. আন্তঃ মহাদেশীয় বিমানপথ উন্নয়নে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পথ বরাবর সম্ভাব্য যাতায়াত আকার ও এর টার্মিনাল। অন্যান্য বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে নৌবহন ও তার নাব্যতার সুবিধাদি প্রাপ্যতা, অনুকুল আবহাওয়া, বন্দর থেকে দূরত্ব, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি। তবে জেট প্লেনের আবির্ভাবে পথে বিরতির সংখ্যা অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

৭. বিমান পথের মাধ্যমে পৃথিবীর এক স্থানের মানুষসহ বিভিন্ন ধরনের মালামাল অতি সহজে স্থানান্তর সম্ভব বিধায় পৃথিবীর কোন দেশ বা স্থানই আজ অতি দূরে নয় এবং বলতে গেলে আন্তসংস্কৃতির এক মিলন মেলা যেন এ পথেই সম্ভব হচ্ছে।

৭.২.৩ উল্লেখযোগ্য বিমান পথ ও বন্দরসমূহ ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বা মহাদেশগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপনকারী বহু ধরনের বিমান পথের অনুসরণ করা হয় তবে, নিম্নলিখিত পথগুলো বেশি অনুসৃত ও গুরুত্বপূর্ণ।

ক) উত্তর আটলান্টিক বিমানপথ ঃ আন্তঃ মহাদেশীয় বিমান পথগুলোর মধ্যে এ পথটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ যা ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। এ পথের বিমানগুলো সাধারণতঃ নিউফাউন্ডল্যান্ড ভায়া মহাবৃত্তরেখা পথ অনুসরণ

করে থাকে। অর্থাৎ দক্ষিণ ইউরোপগামী বিমানগুলো এজোরস হয়ে পরে লিসবন পর্তুগালের দিকে অগ্রসর হয়। উত্তর আটলান্টিক অতিক্রমকারী এ পথটি ১৯৩৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য উদ্বোধন করে যার গুরুত্ব বর্তমানে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তৎকালীন ২৪ ঘন্টার পথ আজ জেট প্লেনের কারণে মাত্র ৬ ঘন্টায় সম্ভব হচ্ছে। এ পথে ফ্রান্স, বৃটেন, সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা প্রভৃতি দেশের বিমানগুলো চলাচল করে থাকে এবং লন্ডন, লিসবন, নিউইয়র্ক, অসলো, বারমুডা, অটোয়া, বুয়েন্স আয়ার্স সান্ডিয়াগো ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিমান বন্দর।

খ) দক্ষিণ-আটলান্টিক বিমান পথ ও বন্দরসমূহ ঃ দক্ষিণ আটলান্টিক অতিক্রমকারী এ পথটি যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ থেকে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ও তাদের বিমান বন্দর পর্যন্ত যাতায়াত করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশের কতকগুলো স্টেট লাতিন আমেরিকার মুখোমুখী অবস্থানের কারণে প্রবেশ দ্বার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পূর্বের মিয়ামী ও পশ্চিমের লস এঞ্জেলস। তাছাড়া নিউ ওরলিন্স ও সান-এন্টিনিও বেশ পরিচিতি। নিউইয়র্ক নগরী থেকে লাতিন আমেরিকার দেশসমূহের মধ্যে সরাসরি আরো অনেক পথ রয়েছে।

ইউরোপ হতে দক্ষিণ আমেরিকায় যাতায়াতকারী চিরায়ত পথগুলো হয়তো নিউইয়র্ক নগরী অথবা বারমুডার মাধ্যমে যার যার গন্তব্য স্থলে পৌছানো সম্ভব। অতি আধুনিক কালের প্রধান প্রধান পথসমূহ সংযোগ স্থাপন করেছে ইউরোপকে আফ্রিকার ডাকার হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল পর্যন্ত।

গ) আফ্রিকার বিমান পথসমূহ ঃ ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে বিমানের অনেকগুলো পথ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য পথগুলোর শুরু লন্ডন, প্যারিস, মাদ্রিদ ও মেরু হয়ে আফ্রিকায় প্রবেশ করে ৩টি সাধারণ পথে, যেমন- একটি পথ আফ্রিকার আটলান্টিক উপকূল হতে ডাকার পর্যন্ত; ২য়টি আলজিয়ার্স অথবা তিউনিস হয়ে মহাদেশে প্রবেশ এবং কেন্দ্রীয় আফ্রিকার দক্ষিণ দিক বর্ধিত। তৃতীয় পথটি কায়রো হয়ে দক্ষিণ দিক বরাবর পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত।

উত্তর আমেরিকার বিমানগুলো ইউরোপ অথবা লাতিন আমেরিকা হয়ে আফ্রিকা মহাদেশে প্রবেশ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ নিউ অরলিনস হতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপের পথে প্রায় ৯৭০০ মাইল এবং দক্ষিণ আমেরিকার পথে প্রায় ১০১০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়।

ঘ) এশীয় বিমান পথ সমূহ ঃ প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম পূর্বক উত্তর আমেরিকা অথবা ইউরোপ থেকে ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরীয় পথ অনুসরণই এশীয় বিমানপথ সমূহের মূখ্য বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া প্রায় সামুদ্রিক জাহাজ চলাচলকারী পথগুলোর মতই এ সব বিমান পথ। দুটো প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথের একটি যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূল হতে জাপানের বিভিন্ন পোতাশ্রয় পর্যন্ত সীমিত থাকে আর দ্বিতীয় পথ টি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বর্ধিত আকারে হনলুলু পর্যন্ত এবং হনলুলু থেকে দূর প্রাচ্যের যেকোন গন্তব্য স্থানে ভূমধ্যপথ বা ওয়েক দ্বীপ অনুসরণ করে। হনলুলুর পথটি প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে বলে একে অনেক বিশাল এলাকা ঘুরতে হয় কিন্তু পরিণামে অনুকূল আবহাওয়ার সুযোগ ঘটে।

পশ্চিম ইউরোপ হতে আগত বিমানগুলো কায়রোয় বিরতির পর এশীয় বিভিন্ন পথ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিশেষ বিশেষ স্থান এবং তারপর পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে পাকিস্তানের করাচী, ভারতের কলিকাতা, থাইল্যন্ডের ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর এবং চীনের হংকং বন্দর পর্যন্ত যাত্রা সমাপ্ত করে থাকে।

ঙ) উত্তর মেরু বিমান পথসমূহ ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূল হতে পৃথিবীর সর্বোচ্চ উপর ইউরোপ পর্যন্ত পথটি ১৯৫২ সালে নুতনভাবে পথ খোলা হয় উত্তর মেরুপথ নামে। পূনঃ জ্বালানীর বিরতি থাকে- কানাডার এডমনটন ও গ্রীণল্যান্ডের থিউলে। পথটি উত্তর মেরুর ১৫০ মাইল ভিতর পর্যন্ত অতিক্রম করে থাকে। পথটি যদিও খারাপ আবহাওয়া দ্বারা আবৃত তথাপি ইহা পশ্চিমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইউরোপ অথবা ইউরোপ থেকে প্রাচ্যের একমাত্র স্বল্পতম পথ।

এছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক আন্তঃমহাদেশীয় ও মহাদেশীয় বিমান পথ রয়েছে যা সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক বাক্যের পাশে টিক চিহ্ন এবং ভুল বাক্যের পাশে ক্রস চিহ্ন দিন

১. আজকের পৃথিবীতে বিমান পথই সবচেয়ে দ্রুততম পথ।
২. বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা বড় ব্যয়বহুল বিধায় ভর্তুকী ছাড়া এ পথ অব্যাহত সুকঠিন নয়।
৩. বিমানকে সর্বোচ্চ ও সর্বদা কার্যক্রম রাখতে স্থায়ী/অস্থায়ী ভিত্তিতে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন নেই।
৪. বিমান বন্দর ও টার্মিনাল নির্মাণে বিশাল অসমতল জাতীয় ভূ-ভাগের বিশেষ প্রয়োজন।

উত্তর ঃ ১.√ ২. × ৩. × ৪. √

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. বিমান পথে __________ বেশ ___________।
২. যেকোন পরিবহণ ব্যবস্থার ______________ বিমান পথের ____________ব্যয় বেশি।
৩. বর্তমান সময়ে ________ বিমানেই ________ ও _____ সংযুক্ত থাকে।
৪. উত্তর আটলান্টিক অতিক্রমকারী এ পথটি ___________ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও _____ উদ্বোধন করে।

উত্তরঃ

১. ভ্রমণ, ব্যয়বহুল।
২. তুলনায়, জ্বালানী।
৩. প্রতিটি, রেডিও, রাডার।
৪. ১৯৩৯, যুক্তরাজ্য।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বিমান পথের ৩টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
২. বিমান পথ ব্যয় বহুল, তিনটি কারণ উল্লেখ করে এটি ব্যাখ্যা করুন।
৩. উত্তর আটলান্টিক বিমান পথের গুরুত্ব উল্লেখ করুন।
৪. পরিবহণ ব্যবস্থা হিসেবে বিমান পথের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৫. পৃথিবীর বিমান পথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

পাঠ- ৭.৪ ঃ পরিবহণ ব্যবস্থা ঃ সড়ক পথ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ বিভিন্ন দেশের সড়কপথের বিবরণ দিতে পারবেন;
- ☞ বিভিন্ন দেশের রেল পথের বিবরণ দিতে পারবেন;
- ☞ বিভিন্ন প্রকার পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- ☞ বিভিন্ন প্রকার পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যা ও তার সমাধান বলতে পারবেন।

ভূমিকা ঃ পরিবহণ ব্যবস্থার সড়ক পথের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা বিদ্যমান এবং ইহা স্থল পরিবহণের একটি অপরিহার্য অংশ বিশেষ। সড়ক পথের মাধ্যমে দেশের ও বাইরের আনাচে-কানাচে স্বল্প দূরত্ব ও সময়ে পণ্য সামগ্রীসহ সাধারণ যাত্রী পরিবাহিত হয়ে থাকে, বিশেষ করে বর্তমান সময়কালে। সড়ক শব্দটি বহুবিধ অর্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কোন কোন স্থান ও দেশে সড়কপথগুলো বেশ প্রশস্ত এবং ভালভাবে আচ্ছাদিত থাকে আবার কোথাওবা দূর্বল এবং অনাবৃত। তবে একটি কথা সত্য, মোটের উপর প্রায় সড়কই অনাবৃত বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলোর, সড়ক পথের উপর সারি সারি ময়লা আবর্জনা পড়ে থাকে যা সহজেই চোখে পড়ে।

৭.৩.১ সড়ক পথের বিবরণ ঃ সাধারণভাবে সড়ক পথের ধরণ অনেকটা রেলপথের ন্যায় হলেও প্রধান পার্থক্য হচ্ছে যে, রেলপথের তুলনায় সড়ক জালিকা বেশি জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে এবং রেলপথ, সামুদ্রিক বা বিমান পথের ন্যায় সেরূপ কোন ধরন লক্ষণীয় নয়। সড়ক পথের আঞ্চলিক বিন্যাসে সবচেয়ে উন্নত ও উৎকৃষ্টমানের সড়কগুলো অ্যাংলো আমেরিকা, ইউরোপ, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, পূর্ব-এশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার পথগুলো উল্লেখযোগ্য। অপর পক্ষে পৃথিবীর বেশীর ভাগ অঞ্চলেই সত্যিকার অর্থে সড়ক পথের চিহ্নই অনুপস্থিত। বিশেষ করে উত্তর আমরেকিা ও ইউরেশিয়ার উত্তর বিশাল এলাকা, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার মধ্যাংশ সমূহ এবং বোর্নিও ও নিউগিনি দ্বীপসমূহে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সড়কের সংখ্যা এলাকা ভিত্তিক বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় যেমন- গড়ে প্রতি ১ বর্গ মাইল এলাকায় ১ মাইল রাস্তা বিরাজ করে। সর্বোচ্চ সড়ক পরিদৃষ্ট হয় ওহিও রাজ্যে যেখানে ৪১০০০ বর্গমাইলের জন্য ৮৫০০০ মাইল গ্রাম্য ও অন্তরাজ্য সড়ক রয়েছে আর সর্বনিম্ন নেভাডা রাজ্য, যেখানে ১০৯০০০ বর্গমাইল এলাকায় মাত্র ২৩০০০ মাইল সড়ক বিদ্যমান। তবে বর্তমানে সুপার হাইওয়ের মাধ্যমে রাজধানী শহর থেকে আন্তঃ রাজ্যগুলোর মধ্যে চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সড়ক পথের নির্দিষ্ট কোন বিন্যাস নেই এবং স্ব স্ব দেশে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে শুধু সড়ক পথের দেশ ভিত্তিক নমুনা হিসেবে আলোচনা করা হলোঃ

বাংলাদেশের সড়ক পথের বিবরণ

২০০১ সালের হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে সর্বমোট ২০৮৫৪ কিমি সড়ক পথ রয়েছে। তন্মধ্যে জাতীয় সড়ক ৩১৪৪ কিমি; আঞ্চলিক সড়ক ১৯৯৬৪ কিমি। এ সড়কগুলো দেশের প্রধান নগরী ও রাজধানী শহর ঢাকার সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগীয় শহর ও জেলা সদরগুলোর সংযোগ রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, যমুনা বহুমুখী সেতু, লালন শাহ সেতু, বুড়ীগঙ্গা সেতু, মহানন্দা সেতু, ধরলা সেতু, সুরমা সেতু ইত্যাদি জাতীয় সড়কগুলো কে সংযুক্ত করেছে। প্রায় ৫০% এ ধরনের সড়কগুলো ইট বিছানো অবস্থায় রয়েছে।

তাছাড়া স্থানীয় সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ছোট ছোট অনেকগুলো রাস্তা দেশের বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রগুলোকে সংযুক্ত করেছে যার মোট পরিমাণ ১৪৯১৬৭ কিমি। এর মধ্যে বি ধরনের ১৪৩৯৩ কিমি (যেগুলো এ ধরনের সড়ককে সংযোগ করেছে) গ্রাম্য পথ ১, ২, ৩ ধরনের পথ রয়েছে যাদের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৭৮২৭ কিমি, ৪৯৫৩৮ কিমি, এবং ৪৭৪০৯ কিমি। বাংলাদেশের সড়কগুলোতে বাস (বড় মাঝারী ও ছোট ধরনের) কার, ট্রাক, মোটর সাইকেল, রিকসা, ভ্যান, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ইত্যাদি যানবাহন চলাচল করে থাকে। তবে কোন নিয়মের বালাই নেই, যখন তখন ট্রাফিক জ্যাম লেগে থাকে।

ইদানিং বিশ্ব রোডের কার্যক্রম চলছে যেটি ভারত, মায়ানমার ইত্যাদিকে সংযোগ করবে।

পাকিস্তানের সড়ক পথের বিবরণ ঃ ২০০০ সালের হিসেবে অনুযায়ী পাকিস্তানের সড়ক পথের মোট পরিমাণ ১,৮৮,০০০ কিমি। তন্মধ্যে ফেডারেল সড়ক ৭১১২ কিমি (এর ভিতর ৯টি জাতীয় হাইওয়ে এবং ১টি মোটর ওয়ে)।

উল্লেখযোগ্য সড়ক পথের মধ্যে ইনডাস হাইওয়ে-১২৬৫ কিমি দীর্ঘ যেটি করাচী থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত গিয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৩০০ কিমি দূরত্ব হ্রাস করেছে। কারাকোরাম হাইওয়ে (ঘ-৩৫) ৭১৩ কিমি দীর্ঘ, সড়কটি ঐতিহাসিক সিল্করোড নামে পরিচিত।

ভারতের সড়ক পথের বিবরণ ঃ ভারত একটি প্রাচীন জনপথ এবং বিশাল দেশ। ২০০০ সালের হিসেব অনুযায়ী সারা ভারতে ২ মিলিয়ন কিমি দীর্ঘ সড়ক পথ বিদ্যমান। তন্মধ্যে ৯৬০০০০ কিমি সারফের্ড সড়ক, ১ মিলিয়নের চেয়ে বেশি পাথর, নুড়ি চুর্নি কৃত পাথর অথবা মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত সড়ক পথ। জাতীয় হাইওয়ে নামে অভিহিত প্রায় ৫৩ টি হাইওয়ে রয়েছে, যাদের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০০০ কিমি এর নীচে এবং এগুলো দেশের প্রায় ৪০% ট্রাফিক মোকাবিলা করে থাকে।

বিরাট দেশ বিধায় বিভিন্ন রাজ্যগুলোর মধ্যে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত। ১৯৫০ সাল থেকে বিভিন্নভাবে সড়কপথের উন্নয়ন চললেও মাত্র ৪০০০০০ কিমি দীর্ঘ সড়ক পথের উন্নতি সাধন করতে পেরেছে। কিন্তু দেশের প্রায় ২৫% এর বেশি গ্রামীণ এলাকায় কোন সড়ক পথের সংযোগ নেই এবং প্রায় ৬০% সড়কই সকল ঋতুতে চলবার উপযোগী নয়। কেরালা, হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবের সকল গ্রামই সকল ঋতু উপযোগী সড়ক দ্বারা সংযোজিত কিন্তু এর বিপরীত চিত্র রয়েছে উড়িষ্যার মাত্র ১৫%, রাজস্থানের ২১% গ্রাম সংযুক্ত। তবে আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় এ সকল সড়ক খুবই নিম্ন পর্যায়ের।

জার্মানীর সড়কপথের বিবরণ ঃ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থায় পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ জার্মানী যার রয়েছে ৬৩৬০০০ কিমি দীর্ঘ সড়ক পথ ২২১০০০ কিমি শাখা সড়ক ও হাইওয়ে। জার্মানীর সড়কগুলো প্রায় ৪৫ মিলিয়ন রেজিস্ট্রিকৃত যানবাহন চলাচল করে থাকে। জার্মানীর সড়কগুলো উন্নত মানের প্রযুক্তিগত এবং উত্তম ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। সড়কগুলোতে ক্রমোচ্চতা পদ্ধতি বিদ্যমান -যেখানে বন/কান্ট্রি লেন (ডধষফবিম, ঋরষফবিম) থেকে শুরু করে অটোবান (মোটরওয়ে) পর্যন্ত রয়েছে। নিম্নে জার্মানীতে বিভিন্ন ধরনের সড়ক পথের বিবরণ তুলে ধরা হলো, যেমন-

(১) ফরেস্ট/কাউন্ট্রি লেন (Waldweg, Fildweg)
২) সিটি স্ট্রীম (StraBe)
৩) কম্যুনিটি লিংক রোডস
৪) কাউন্টি রোডস
৫) স্টেট রোডস
৬) ফেডারেল রোডস
৭) মোটর ওয়েস (অটোব্যান)
৮) ইউরোপীয় হাইওয়েস।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সড়ক পথের বিবরণ

সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় যার রয়েছে প্রতিটি স্টেটের সঙ্গে সুপার হাইওয়ের মাধ্যমে সংযোগ। ২০০২ সালের হিসেব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে ৩.৯ মিলিয়ন মাইল সড়ক পথ রয়েছে এবং এর মধ্যে ৪৫% কাউন্টি, ৩০.৬% স্থানীয় (শহর, মিউনিসিপ্যালিটিসহ), ১৯.৬% স্টেট ৩% ফেডারেল এবং ১.৮% অন্যান্য নিয়ন্ত্রণাধীন। শুধু মোটর ট্রিপের জন্য সমস্ত যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপী ১১ টি পথ রয়েছে। যেমন- কোষ্টাল ওয়েস্ট কোস্ট, দি এ্যাপোলিসিয়ান ট্রেল, কোস্টাল ইস্ট কোস্ট, টঝ-২ দি গ্রেট নর্দান, টঝ-২০ দি ওরিগন ট্রেলঘ টঝ-৫০: দি লোনলিয়স্টে রোডঘ টঝ-৮০: সাউদার্ন প্যাসিফিক এবং রুট ৬৬ঃ দি মাদাররোড।

জাপানের সড়ক পথের বিবরণ

১৯৯৭ সালের হিসেবে অনুযায়ী জাপানে সর্বমোট ১১৫৬৩৭১ কি.মি. সড়ক পথ রয়েছে তন্মধ্যে ন্যাশনাল এক্সপ্রেস ওয়েস ৬৪০২ কিমি; ন্যাশনাল হাইওয়ে ৫৩৬২৮ কি.মি. প্রিফেকচারাল রোডস ১২৭৯১১ কি.মি. মিউনিসিপ্যাল রোডস ৯৬৪৪৬০ কিমি; এবং জেনারেল রোডস ১১৪৬০৯২.৩ কিমি।

তুরস্কের সড়ক পথ

তুরস্কের সর্বমোট ৩৮২০৫৯ কিমি সড়ক পথ রয়েছে এবং এর ভিতর ১০৬৯৭৬ কিমি আবৃত এবং ২৭৫০৮৩ কিমি অনাবৃত সড়ক পথ বিদ্যমান।

ইরানের সড়কপথ

ইরানে সর্বমোট ১৪০২০০ কিমি সড়ক পথের মধ্যে ৪৯৪৪০ কিমি আবৃত এবং ৯০৭৬০ কিমি অনাবৃত পথ রয়েছে।

মিশরের সড়কপথ

মিশরে সর্বমোট ৬৪০০০ কিমি সড়ক পথের মধ্যে ৫০০০০ কিমি আবৃত এবং ১৪০০০ কি.মি. অনাবৃত সড়ক পথ রয়েছে।

চীনের সড়ক পথের বিবরণ

চীনের সর্বমোট সড়ক পথের পরিমাণ প্রায় ১ মিলিয়ন কিমি। চীনের প্রতিটি প্রদেশের সঙ্গে সড়ক পথের সংযোগ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য সড়কপথের সিচুয়ান তিব্বত সড়ক ১৪১৩ কি.মি. ছিংহাই তিব্বত ১৯৬৫ কি.মি. সিনজিয়াং তিব্বত ১৪৫৫ কি.মি. বেজিং সাংহাই সড়ক পথ ইত্যাদি।

সৌদি আরবের সড়ক পথের বিবরণ

সৌদি আরবের মোট সড়ক পথের পরিমাণ ১৫২০০০ কিমি এবং এর মধ্যে ৪৫৫০০ কিমি এসফলট সড়ক, ১০৬০০০ কিমি আবৃত কৃষিজপথ। উল্লেখযোগ্য সড়কপথ হচ্ছে মক্কা-মদীনা, হাইওয়ে ৪২১ কি.মি., জেদ্দা-মক্কা হাইওয়ে ৬০ কি.মি. রিয়াদ-সাইয়েদার আল কাসিম ৩১৭ কি.মি. রিয়াদ-দাম্মান হাইওয়ে ৩৮৩ কি.মি. রিয়াদ-তাইফ হাইওয়ে ৭৫০ কি.মি. জেদ্দা-আল-লিথ জিজান হাইওয়ে ৭২৫ কি.মি. মদিনা-তাবুক হাইওয়ে ৬৮০ কি.মি. এবং আল কাসিম -হেল হাইওয়ে ৩৫০ কি.মি.।

৭.৩.২ পরিবহণ ব্যবস্থা ঃ রেলপথ

স্থল পরিবহণ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত রেলপথ যার শুরু ১৮২৫ সালে জর্জ স্টিফেনসন কর্তৃক বাম্পচালিত ইঞ্জিন চালুর পরে এবং বর্তমানে অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ক্ষেত্রে এটিই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা বিশেষ করে স্বল্প দুরত্বের ক্ষেত্রে সড়ক পথের প্রতিদ্বন্দ্বি কিন্তু বেশি ও কম মূল্যের দ্রব্যাদি দীর্ঘতম পথ পাড়ি দিবার যানবাহন হিসেবে এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বি। রেল পরিবহণে রেলপথ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, স্টেশন নির্মাণ ইত্যাদি ব্যয় বহুল বিধায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশের সরকার ই-মালিক অর্থাৎ সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্রাথমিক পর্যায়ে সমতলভূমিতে রেলপথের প্রচলন থাকলেও বর্তমান সময়ে রেলপথ বিভিন্ন প্রকার ভূ-প্রকৃতি যেমন সমতল ভূমি, পাহাড়ী এলাকায়, দূর্গম বনভূমি বা খনিজ এলাকায় ইত্যাদি দেখা যায়। যেকোন জলবায়ু অধ্যুষিত অঞ্চলে এর বিস্ত ৃতি রয়েছে। যেহেতু এ পথ অব্যাহত রাখা সরকারের দায়িত্ব এবং ব্যয় বহুল, সুতরাং অনুন্নত দেশের তুলনায় উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে বিশেষ করে উত্তর আমেরিকার উত্তর পশ্চিম ইউরোপের মত দেশসমূহে এবং জালিকা সদৃশ্য এর বিস্তার ঘটেছে সড়ক পথ বিস্তারনের ন্যায়। এমনকি ভারতসহ উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পাতাল রেলপথ ও চালু রয়েছে রেলপথের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অংশ অথবা মহাদেশের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যাত্রীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মালামাল পরিবাহিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ সমূহ মহাদেশীয় রেল পথ নামে পরিচিত। অর্থাৎ কোন মহাদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যে রেলপথের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করা হয় সাধারণতঃ তাকেই মহাদেশীয় রেলপথ নামে অভিহিত করা হয়। আবার কোন একটি বড় রাষ্ট্রের দুই বা ততোধিক প্রান্তিক এলাকাকে সংযোগ স্থাপনকারী দীর্ঘ রেলপথ চালু থাকলে তাকেও মহাদেশীয় রেলপথ বলা হয়ে থাকে। এসব মহাদেশীয় রেলপথ অতিক্রমকারী বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য রেলপথগুলো দেশ ভিত্তিক আলোচনা করা যাচ্ছেঃ

রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রেলপথসমূহ

ক) ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেলপথ

প্রায় ৮৬৪০ কিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এ রেলপথটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যা রাশিয়ার লেনিন গ্রার্ড-মস্কো হতে প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী ব্লাস্তিভোস্কক শহর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং রাশিয়ার পশ্চিমে ইউরোপীয় অংশ হতে পূর্ব দিকস্থ এশিয়ার অংশকে সংযুক্ত করেছে। এর বিভিন্ন শাখা ও উপশাখা দেশের অভ্যন্তরস্থ বিখ্যাত তেলখনি ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ শহরসমূহকে অতিক্রম করেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে এর ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান।

মহাদেশীয় এ রেল পথটির একটি শাখা চিতা নামক স্থানে থেকে বেরিয়ে মাঞ্চুরিয়ার ভিতর দিয়ে মুকডেন পিকিং পর্যন্ত এবং অন্য একটি শাখা উলানউদ নামক স্থান থেকে মঙ্গোলিয়ার উলান বাটোর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এ রেলপথ দিয়ে কয়লা, তেল, গম, ভূট্টা নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্যাদি পরিবাহিত হয়ে থাকে।

খ) ট্রান্স কাস্পিয়ান রেলপথ ঃ রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম রেলপথ যেটি মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন বর্তমানে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশসমূহকে সংযুক্ত করেছে। কাস্পিয়ান হ্রদ তীরস্থ ক্রাসনো ভোডস্ক থেকে সমরখন্দ, বোখারা ও তাসখন্দ কুইবিশেভে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথের সঙ্গে মিলিত হয়ে মস্কো পর্যন্ত পৌছেছে। এর একটি শাখা মাত হতে আফগানিস্তানের সীমান্ত শহর কুশক পর্যন্ত গেছে। এ পথ দিয়ে মূলতঃ তুলা, গম, তৈল ও নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যাদি যাতায়াত করে থাকে।

গ) ট্রান্সককেশীয় রেলপথ ঃ মস্কো হতে বাকু হয়ে আজারবাইজান, জর্জিয়ার ভিতর দিয়ে কৃষ্ণসাগরতীরস্থ বাটুম বন্দর পর্যন্ত গেছে। এ রেলপথে খনিজ তৈল, কয়লা, তুলা ও চা পরিবাহিত হয়ে থাকে।

কানাডীয় রেলপথ

১) ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ ঃ কানাডার নিউব্রান্স উইকের নিকটস্থ সেন্টজন থেকে শুরু করে মেন, মন্ট্রিল, সেন্টলরেন্স অটোয়া সার্ডবেরী, সুপরিয়র হ্রদ পোর্ট আর্থার, ফোর্ট উইলিয়াম, উইনিপেগ প্রেইরী অঞ্চল হয়ে রেজিনা, ক্যালগারী, রকি পর্বতের কিকিংহর্স গিরিপথ, কলম্বিয়া উপত্যকা, শেল কার্ক গিরিশৃঙ্গ, ফ্রেজার নদী অতিক্রম পূর্বক প্রশান্ত মহাসাগর তীরস্থ ভ্যাংকুবার শহর পর্যন্ত গিয়েছে। সুদীর্ঘ এ রেলপথটি সর্বমোট ৩৭৬৫৮ কিমি পথ অতিক্রম করে এবং এর অনেকগুলো শাখা পথও বিদ্যমান।

২) কানাডীয় জাতীয় রেলপথ/কানাডীয় ন্যাশনাল রেলপথ ঃ প্রশান্ত মহাসাগর তীরস্থ ভ্যাংকুবার শহর থেকে শুরু করে যথাক্রমে ফ্রেজার উপত্যকা, ইউলোহেড গিরিপথ রকি পর্বত দিয়ে এডমন্টন, সাচ কাচুয়ান ইউলিপেগ দিয়ে কানাডিয়ান-প্যাসিফিক রেলপথের সঙ্গে মিশে এবং সেখান থেকে অন্টারিও কুইবেক শহর হয়ে হ্যালিফাক্স বন্দর পর্যন্ত গিয়েছে। এখান থেকে ৩টি শাখা লাইন বেরিয়ে একটি শাখা দেশের উত্তর পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর তীরস্থ প্রিন্স রূপ বন্দর ২য়টি হাডসন উপসাগরের তীরবর্তী চার্টিল বন্দর এবং ৩য় শাখাটি হাডসন উপত্যকার তীরস্থ মুসোনী বন্দর পর্যন্ত গিয়েছে। এ রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭৩৭০ কিমি এবং মূলতঃ কাঠ, মৎস্য ও গম পরিবাহিত হয়ে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথ

১) ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলপথ ঃ যুক্তরাষ্ট্রের এটি সর্ববৃহৎ রেলপথ যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫৪২ কিমি। নিউইয়র্ক হতে শুরু করে চিকাগো শহর আইওয়া, নেব্রাস্কা, ওয়েমিং, উটাহ, নেভাডা, রকি পর্বত মালা হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী সানফ্রান্সিসকো এবং লস এঞ্জেলস পর্যন্ত গিয়েছে। সাধারণতঃ এ পথ দিয়ে কৃষিজ, খনিজ দ্রব্যাদি পরিবাহিত হয়।

২) নর্দান প্যাসিফিক রেলপথ ঃ প্রায় ৩০৫৯ কিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এই রেলপথটি যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম যেটি আটলান্টিকের উপকূলবর্তী নিউইয়র্ক বন্দর থেকে শুরু করে বাদেলো, চিকাগো, সেন্টপল, বিসমার্ক শহর, রকি পর্বত অতিক্রম পূর্বক প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী সিরাটল বন্দর, পোর্টল্যান্ড এবং সানফ্রান্সিসকো বন্দর পর্যন্ত গিয়েছে। সাধারণতঃ এ পথ দিয়ে মাংস, শিল্পজাত দ্রব্যাদি পরিবাহিত হয়ে থাকে।

৩) সাউদার্ন প্যাসিফিক রেলপথ ঃ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের এ পথটি সানফ্রান্সিসকো বন্দর থেকে শুরু করে রকি পর্বত মালা, মেক্সিকো উপসাগরীয় তীরস্থ নিউঅরলিন্স, ওয়াশিংটন ও বাল্টিমোর পর্যন্ত গিয়েছে। নিউ অরলিন্স থেকে এ পথেরই একটি শাখা লাইন মিসিসিপি নদী উপত্যকা বরাবর চিকাগো পর্যন্ত যায়। এ রেলপথটি তুলা, গম, নানা প্রকার ফল ও খনিজ দ্রব্যাদি পরিবহণে ব্যবহৃত হয় এবং এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০০ কিমি।

দক্ষিণ আমেরিকার রেলপথ

চিলি-আর্জেন্টাইন রেলপথ ঃ দক্ষিণ আমেরিকার সর্ববৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ এ রেলপথটির দৈর্ঘ্য ১৪৪৯ কিমি এবং এটি আটলান্টিক মহাসাগর তীরস্থ বুয়েনস আর্ডাম বন্দর থেকে শুরু করে প্যারানা নদী উপত্যকা অতিক্রম পূর্বক মেনডোজা (আর্জেন্টিনার প্রখ্যাত গম ও পশুচারণ ক্ষেত্র) হয়ে আন্ডিজ পর্বতমালা হয়ে মধ্য মধ্যচিলির ভ্যাল প্যারাইসোঁ বন্দর পর্যন্ত গিয়েছে। এই পথ দিয়ে নানা প্রকার পশুজাত দ্রব্যাদি পরিবাহিত হয়ে থাকে।

আফ্রিকা মহাদেশের রেলপথ

১) কেপ কায়রো রেলপথ ঃ ১৪৪৯ কিমি দীর্ঘ বিশিষ্ট এ রেলপথটি মূলতঃ কেপটাউন থেকে কায়রো পর্যন্ত নির্মাণ প্রকল্প থাকলেও এটি বর্তমানে রেলপথ, পানিপথ ও সড়কপথের সমষ্টিমাত্র। এ রেলপথটি কেপটাউন হতে বুলাওয়ে এলিজাবেথ ভেলি, বেলজিয়াম, কঙ্গোর বুকামা শহর ও বুকামা হতে খার্তুমে এবং খার্তুম থেকে ওয়াদিহাইফা পর্যন্ত রেলপথে যাওয়া যায়। আবার জলপথে সেলাল পর্যন্ত এবং সেখান রেলপথে কায়রো পর্যন্ত গিয়েছে। এ রেলপথ দিয়ে অতিক্রম কারী দেশসমূহের কয়লা, লৌহ, তামা ও হীরক, তুলা প্রভৃতি পরিবাহিত হয়ে থাকে।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশেরর রেলপথ

১) ট্রান্স অস্ট্রেলিয়ান রেলপথ ঃ এ রেলপথটি অস্ট্রেলিয়ার পার্থ হতে শুরু করে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় স্কুলগাডি কার্লগুলি ও এডিলেড পর্যন্ত গিয়েছে। এডিলেডে দুটি লাইনে বিভক্তি হয়ে একটি শাখা এডিলেড থেকে সিডনী হয়ে ব্রিসবেন এবং দ্বিতীয় শাখা লাইনটি মেলবোর্ন পর্যন্ত চলে গেছে। অপর শাখা লাইনটি ব্রিগবেন থেকে রকহ্যাপটন হয়ে ক্লনক্যারী পর্যন্ত গিয়েছে। এ পথ দিয়ে ফল, সোনা, খনিজ দ্রব্য, মাংস, দুধ, পশম ইত্যাদি প্রেরিত হয়ে থাকে।

তাছাড়া ছোট বড় অভ্যন্তরীণ পথে অনেক রেলপথ বিদ্যমান। পরিশেষে এটুকু বলা যায় যে, বর্তমান পৃথিবীর বুকে বাণিজ্যিকভাবে প্রায় ৭৮০০০০ মাইলেরও বেশি রেলপথ রয়েছে, তবে সে গুলোর বন্টনের ক্ষেত্রে অসমতা বিদ্যমান।

৭.৩.৩ বিভিন্ন প্রকার পরিবহণ ব্যবস্থায় সুবিধা ও অসুবিধা

পরিবহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র, মহাদেশ, অঞ্চল ইত্যাদির সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী ও যাত্রী সাধারণের স্থানান্তর, চলাচল, পারাপার, বিনিময় ইত্যাদি নিত্য ঘটনা যার মাধ্যমে সবকিছুকে একত্রে সংযোগ স্থাপন তথা দেশীয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পরিবহণ ব্যবস্থা তিন ধরনের, যথা- বিমান, জল ও স্থল পবিরহণ এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে এ তিন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসাবে করে থাকে।

স্থল পরিবহণ ঃ ভূ-পৃষ্ঠস্থ স্থলভাগের উপর দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য ও লোকজনের চলাচলের নিমিত্তে ব্যবহৃত পথই স্থলপথ হিসেবে অভিহিত। স্থলপথ পরিবহণে পায়ে হেটে, গরু বা মহিষ চালিত গাড়ী ইঞ্জিন চালিত গাড়ী, সাইকেল, মোটর সাইকেল, রেল ইত্যাদি ধরনের যানবাহন পরিবহণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোন দেশের কৃষিজ, বনজ, খনিজ ও শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি ও বিকাশের স্থল পথের ভূমিকা অপরিসীম। স্থলভাগ বিশেষ করে সমতল প্রশস্ত ভূ-ভাগে স্থলপথ বেশি উন্নত মানের এবং কম ঝুকিপূর্ণ। স্থলপথ আবার পাকা, সড়ক পথ ও রেলপথ এই দুইভাগে বিভক্ত। সড়ক পথকে আসার প্রধান পথ, শাখা পথ ও গ্রাম্য পথ নামে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ধরনের পথে পরিবহণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বকীয়তা বজায় রেখে এবং সমভাবে অঞ্চলের জাতির তথা রাষ্ট্রের উন্নতিতে অবদান রাখছে। যে সকল পথ ইট, সিমেন্ট, বালি বা পাথর দিয়ে প্রস্তুত তাদেরকে সাধারণতঃ পাকা রাস্তা বা সড়ক বলা হয়। অঞ্চলভেদে (জলবায়ুগত অবস্থা, ভূমিরূপগত অবস্থা) ও আর্থিক পার্থক্যের দরুন, পাকা রাস্তা বা সড়কগুলো কোথাওবা বেশ প্রশস্ত, সরু চাপা ইত্যাদি ধরনের হয়ে থাকে। সাধারণতঃ যে সকল রাস্তাঘাট দেশের প্রধান প্রধান অংশসহ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সরাসরি অতিক্রম করে থাকে সে সকল সড়ককে প্রধান পথ বা রাজপথ বলা হয়ে থাকে। আর প্রধান পথের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী পথগুলোকে শাখা পথ এবং বিভিন্ন গ্রাম্য জনপথকে সংযোজককারী অপেক্ষাকৃত কাঁচা, সরু পথগুলোকে গ্রাম্য পথ বা মেঠো পথ নামে অভিহিত করা হয়। গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের এই তিন ধরনের সড়কই দেখতে পাওয়া যায়। এখন সড়ক জালি বিন্যাস অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হিসেবে পরিচিত।

অপর পক্ষে যে পথের উপর দিয়ে রেলগাড়ী চলাচল করে তাকে রেলপথ বলা হয়। ১৮২৫ সালে জর্জ স্টিফেনসন কর্তৃক রেলগাড়ী আবিস্কার পূর্ব পর্যন্ত কাষ্ঠ নির্মিত তবে মানুষ ও পশু চালিত রেলগাড়ীর প্রচলন ছিল এবং ১৮২৫ সালের পর থেকে যথাক্রমে কাঠ, লৌহ, কয়লা, জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আজ অবধি বিদ্যুৎ চালিত ট্রেনের বিকাশ ঘটেছে। রেলপথ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন- ব্রড গেজ (১.২৬-১.৬৭ মিঃ প্রশস্ত পথ), স্ট্যান্ডার্ড গেজ (১৪২ মিঃ প্রশস্ত পথ) মিটার গেজ (.৯৯ মি প্রশস্ত পথ), এবং ন্যারো গেজ (০.৬০-০.৭৬ মি প্রশস্ত পথ) ইত্যাদি।

জলপথ ঃ জলভাগের (খাল, বিল, নদী, নালা, হাওড়, সমুদ্র, হ্রদ ইত্যাদি) উপর দিয়ে বিভিন্ন বাহনের (নৌকা, স্টীমার, ছোট বড় জাহাজ, কার্গো, ডিঙ্গি, ভ্যালা, ইত্যাদি) সাহায্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যাদিসহ যাত্রী পারাপার ও স্থানান্তর করণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়াকেই জলপথ পরিবহণ বলা হয়ে থাকে। এটি একটি আদিমতম যোগাযোগ মাধ্যম হলেও বর্তমানে এর গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সকল জলভাগই সব ঋতুতে সমানভাবে জলপথের উপযোগী নয় হেতু এপথের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাছাড়া ভূ-প্রকৃতিগত পার্থক্য ও জলবায়ুগত তারতম্যের কারণেও এ পথ আরো সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ রেখেছে। অর্থাৎ ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুগত পার্থক্যের কারণে জলপথের বিকাশ ও বাধাগ্রস্ততা পরিলক্ষিত। জলপথ প্রধানতঃ ২ ধরনের, যেমন- (১) অভ্যন্তরীণ জলপথ ও (২) বহিঃ দেশীয় বা সামুদ্রিক জলপথ। কোন দেশের অভ্যন্তরস্থ জলপথই (নদী, হ্রদ, খাল, বিল, ইত্যাদিকে) অভ্যন্তরীণ বা অন্তর্দেশীয় জলপথ অর্থাৎ অতি প্রাচীনকাল থেকেই দেশের নাব্য নদ-নদী ও খাল-বিলের ভিতর দিয়ে পরিচালিত জলপথই অন্তর্দেশীয় জলপথ হিসেবে পরিগণিত। এ পথের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে ভারবাহী মালপত্র আনা নেয়া হয়ে থাকে এবং এসব কাজের জন্য দেশীয় নৌকা বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও বাণিজ্যের উন্নতি বিকাশে অন্তর্দেশীয় জলপথের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলপথগুলো ঢাকা থেকে খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, ইত্যাদি অঞ্চলগুলোর জন্য সার্বিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বিমানপথ ঃ রাইট ভাতৃদ্বয়ের উড়োজাহাজ আবিস্কারের পর থেকে আজ অবধি বিমান পথের চেয়ে দ্রুততম সময়ে যাত্রীসহ মালামাল পরিবহণের সমকক্ষ আর কোন পথ নেই এমনকি সব ধরনের প্রকৃতিগত বৈরিতা সত্ত্বেও এ পথের ক্রমবিকাশকে কোনভাবেই হ্রাস করতে সক্ষম হয়নি বরং এর গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির দিকে। বর্তমান পৃথিবীর নানান ধরনের সামগ্রী কার্যকলাপ, যুদ্ধ বিগ্রহ, ঝড় বন্যা খরা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি মোকাবিলায় বিমান পথের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বিমান পথ সাধারণতঃ দু ধরনের, যেমন- অভ্যন্তরীণ বিমান পথ এবং বহিঃ দেশীয় বিমান পথ। দেশের ভিতরের বিভিন্ন অংশের সংগে শুন্য বা আকাশপথের সংযোগকে বা পারাপারকে অভ্যন্তরীণ বিমানপথ এবং বিভিন্ন দেশের বা মহাদেশের সঙ্গে আকাশ পথের সংযোগকে বহিঃ দেশীয় বিমান পরিবহণ নামে খ্যাত।

৭.৩.৪ বিভিন্ন পরিবহণের তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধা

ক. বিমান পথের সুবিধা

১. বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত বিভিন্ন পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে বিমান পরিবহণই সর্বাধিক দ্রুততম ব্যবস্থা যার বদৌলতে পৃথিবীর কোন স্থান বা দেশই বেশি দুরে নয় কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র।
২. বিমান পরিবহণের জন্য কোন পথ নির্মাণ করতে হয় না বলে এতে কোন নির্মাণ খরচ নেই।
৩. বিমান পরিবহণের সাহায্যে পৃথিবীর পাহাড় পবর্তসহ যে কোন দুর্গম অঞ্চলে যাতায়াত সম্ভব।
৪. বিমান পথে ভ্রমণ সত্যিকার অর্থে সবচেয়ে সহজ, আরাম দায়ক ও চিত্তাকর্ষক তথা আভিজাত্যতা প্রকাশ পায়।
৫. সামরিক অভিযান, দূর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ বিগ্রহ, শান্তি শৃংখলা নানা প্রকার বিপজ্জনক কার্যাদি মোকাবিলায় বিমান পরিবহণের বিকল্প নেই।
৬. জমিতে পঙ্গপালের আক্রমণ, শহরাঞ্চলে মশা মাছির উপদ্রপ ইত্যাদি থেকে পরিত্রাণের নিমিত্তে কীটনাশক ঔষধ স্প্রে বা ছিটানো জাতীয় কার্যাদি বিমানের সাহায্যে সুষ্ঠভাবে সমাধা সম্ভব।
৭. মাছ, মাংস, ফলমূল, শাক সবজি ইত্যাদি পচনশীল দ্রব্যাদি বিমান মারফত বিশ্ব বাণিজ্য বাজারে স্বল্প পৌছে দেয়া সম্ভব।
৮. বিমান পরিবহণ সর্বদাই সোজা পথ গ্রহণ করে বিধায় দূরত্বের হ্রাস ঘটে, সময় ও বাঁচে।
৯. বিমান পরিবহণের তেমন কোন ট্রাফিক জ্যাম ঘটে না বলে দুর্ঘটনাও কম ঘটে থাকে।

অসুবিধাসমূহ

১. বিমান পথ নির্মাণ ব্যয় না হলেও বিমান বন্দর ও গোডাউন নির্মাণ, টার্মিনাল নির্মাণ, রানওয়ে নির্মাণ, আধুনিক বিভিন্ন ধরনের বিমান কর্মকর্তা, কর্মচারী ইত্যাদির জন্য আবাসন নিমিত্তে বিশাল সমতলভূমি ইত্যাদি ক্রয় বেশ ব্যয় বহুল বিধায় ইহা পরিচালনাসহ রক্ষণাবেক্ষণে বেশ ব্যয় করতে হয় বিধায় ইহা ব্যয়বহুল। সুতরাং যে কেউ ইচ্ছা করলে ইহার মালিকানা বা পরিচালনা করতে সক্ষম নয়।
২. বিমান পরিবহণ কর্তৃত্ব সাধারণতঃ দেশের সরকারের উপর নির্ভরশীল।
৩. সবরকম ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুতে চলাচল ও বরফ কুয়াশাচ্ছন্নতা, মেঘাচ্ছন্নতা ও অতি বৃষ্টি ও অতি গরম ইত্যাদি বিমান চলাচলের বিঘ্ন ঘটে, যাত্রী ও কম হয় এবং মালপত্র ওঠা নামা ও অসুবিধা হয়।
৪. বিমান ভ্রমণ আরাম দায়ক ও চিত্তাকর্ষক হলেও ব্যয় বহুলতার দরুন ইহা সাধারণ ধরনের লোকজন বা যাত্রীদের নাগালের বাইরে।
৫. ইহা মূলতঃ বড় বা ধনী লোকদের বিলাস ভ্রমণ সামগ্রী বৈ আর কিছু নয়।
৬. বর্তমান সময় কালে বিমানে হাইজ্যাক, জিম্মীসহ নানা রকমরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে ফলে যাত্রীসহ অনেক বিমান পথই বন্ধ হবার উপক্রম।

খ. সামুদ্রিক পথের সুবিধাবলী

১. সামুদ্রিক পথ প্রকৃতিতে বলে এতে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্তে কোন রাহা খরচ নেই বিধায় মালামালসহ যাত্রী ভাড়া খুব কম ও সহজ যা সব ধরনের লোকজনের আওতাভূক্ত।
২. ভারী প্রকৃতি পণ্য সামগ্রী স্থানান্তর করণের সহজ উপায় হচ্ছে জলপথ বিশেষ করে বন্যা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময়গুলোতে এবং সকল ঋতুতেই পানি আবৃত স্থানগুলোতে।
৩. আজকের পৃথিবীর কোন দেশই তাদের কৃষিজ, শিল্পজ, খনিজ, বনজ বাণিজ্য ব্যবসায় ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতি সাধনে সামুদ্রিক পথ ছাড়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ রপ্তানী ও আমদানী মূলক কার্যকলাপে সামুদ্রিক পথ ব্যতীত সম্ভব নয়।
৪. সমুদ্র পথ প্রকৃতির দান বিধায় সকল দেশ ও জাতির জন্য সমান প্রবেশাধিকার বিদ্যমান। এ পথে কোন খাজনা বা ট্যাক্স দিতে হয় না বলে যাতায়াত সহ মালভাড়া খুবই কম হয়ে থাকে।
৫. সমুদ্র পথ উন্মুক্ত ও বিশাল বলে যে কোন আকারের জাহাজ, কার্গো অনায়াসে চলাচল করতে পারে।

অসুবিধাবলী

১. জলপথে পরিবহণ তুলনামূলকভাবে আরাম দায়ক হলেও বিপদের আশংকা বিদ্যমান বিশেষ করে আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে।
২. সমুদ্র পথে যাতায়াতের সময় সাপেক্ষে ব্যাপার বিধায় পচনশীল পণ্য সামগ্রী পরিবহণ অসুবিধা জনক।
৩. সমুদ্র পথ ভ্রমণসহ মালামাল পরিবহণ ব্যয় সবচেয়ে কম বলে ও সময় বেশি নষ্ট হয়।

৪. সমুদ্র পথে বিশাল ও উন্মুক্ত হলেও নানা প্রকার ভৌগোলিক বাধা যেমন- মগ্নচড়া, ডুবন্ত বালুচর, অগভীর খাত ইত্যাদির উপস্থিতিতে যাতায়াত বাধাগ্রস্থ হতে পারে।

গ. সড়ক পথের সুবিধাবলী

১. বর্তমান পৃথিবীতে সড়কপথের যাতায়াত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কেননা অন্যান্য পবিরহণের চেয়ে এ পথে যেকোন স্থানে যে কোন মুহূর্তে অতি সহজেই যাতায়াত সম্ভব।

২. যে কোন ভূ-প্রকৃতিতে সড়ক পথ নির্মাণ করা যায় তবে অন্যান্য মাধ্যমের চেয়ে ব্যয় কম।

৩. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, যাতায়াত, দুর্গম স্থানে গমন ইত্যাদি সড়ক পথেই বেশি উপযোগী।

৪. হালকা, পচনশীল পণ্য সামগ্রী (কৃষিজ, শিল্পজ) ইত্যাদি অতি সহজে খদ্দেরদের নিকট পৌছে দেয়া সম্ভব একমাত্র সড়ক পথেই।

৫. রেলপথ বিমান পথ যে সকল স্থানে অনুপস্থিত সে সব স্থানে সড়ক পথই একমাত্র অবলম্বন।

৬. জাতীয় প্রয়োজনে যেমন বন্যা, দূর্ভিক্ষ, মহামারী, সংঘর্ষ ইত্যাদি স্থান সমূহ অল্প সময়ে নিরাপত্তা বাহিনী সহ ত্রাণ সামগ্রী পৌছে দেয়া একমাত্র সড়ক পথেই সম্ভব।

৭. সকল পরিবহণ ব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে সড়ক ব্যবস্থা গণ্য হয়ে থাকে।

অসুবিধাবলী

১. সড়ক পথের রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ বেশ খরচ বহুল কাজ যদিও নির্মাণ খরচ তত বেশি নয়।

২. সড়ক পথে বেশি ও ভারী জাতীয় পণ্য সামগ্রী বহন সুবিধাজনক নয়, হইলেও ঝুঁকি থাকে এবং ব্যয় বহুল।

৩. সড়ক পথে অনেক সময় ট্রাফিক জ্যাম, দূর্ঘটনা বেশি ঘটে থাকে।

৪. সড়ক পথে নানান ধরনের চাঁদাবাজি, মাস্তানদের উৎপাত, টার্মিনাল গুলোতে রাজনৈতিক কোন্দলের সূত্রপাত হয়। অনেক সময় এসব নিয়ে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে থাকে এবং যাত্রী সাধারণের দুদর্শার চরম অবস্থায় পতিত হতে হয়।

৫. সড়ক পথে চলাচল অনেক সময় বিপজ্জনক রূপ ধারণ করে বিশেষ রাত্রী কালিন ভ্রমণে।

৬. সড়ক পথের বাসভাড়া নিয়ে অনেক সময় কন্ডাক্টর ও যাত্রীদের মধ্যে বাক বিতন্ডা থেকে শুরু করে মারামারি সহ অন্যান্য অপ্রীতিকর ঘটনার সুত্রপাত ঘটে।

ঘ. রেলপথের সুবিধাবলী

১. বেশি পরিমাণে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণে রেল পথের সমকক্ষ আর অন্য কোন পরিবহণে নেই।

২. রেলপথ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ বেশি ব্যয়বহুল হলেও দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির।

৩. অন্যান্য পরিবহণের তুলনায় রেলপথে সংঘটিত দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কম।

৪. যুদ্ধ বিগ্রহ, মহামারী প্রভৃতিতে রেলপথের ব্যবহার বেশি ও বেশি দরকারী।

৫. রেলপথে ভ্রমণ বেশ আরামদায়ক, ভাড়া ও কম এবং সব ধরনের মালামাল পরিবহণ নিরাপদ।

৬. অন্যান্য পরিবহণের তুলনায় রেল পরিবহণ ব্যবহার বেশি লোকের অর্থসংস্থান হয়ে থাকে।

অসুবিধাবলী

১. রেলপথ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় বেশ অর্থের যোগান দিতে হয়।

২. সব ঋতুতেই রেলপথে যাতায়াত করা যায় না বিশেষ করে বর্ষাকালে।

৩. রেলপথের মাধ্যমে দেশের অত্যন্ত দুর্গম স্থানে মালামাল পরিবহণ সম্ভব নয়।

৭.৩.৫ পরিবহণ ব্যবস্থার সমস্যা ও এর প্রতিকার

পরিবহণ সমস্যা ঃ অনেকের মতে বর্তমান বিশ্বে পরিবহণ ব্যবস্থার বিভিন্ন খাতে অসম্ভব ধরনের উন্নয়ন ঘটেছে যার ফল শ্র*তিতে প্রতিটি দেশই যেন নাগালের বাইরে নয় এবং হয়তো ১ মিনিট বন্ধ* থাকলে সমস্ত পৃথিবীর বুকে স্থবিরতা নেমে আসতে বাধ্য। অর্থাৎ পরিবহণ ব্যবস্থার ক্রম বিকাশের সঙ্গে পৃথিবীর সকল দেশের উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। তাই এর গুনাগুণ অপরিসীম তবে এতে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য সমস্যা। বিশ্ব জুড়ে পরিবহণ ব্যবস্থার বহুবিধ সমস্যা রয়েছে, তবে উন্নত বিশ্ব ও বিশ্বের দেশগুলোর পরিবহণ সমস্যার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান এবং কমবেশী নিম্নভাবে সনাক্ত করা সম্ভব, যেমন-

১) পরিবেশ দূষণ ঃ ক) পরোক্ষভাবে এবং খ) প্রত্যক্ষভাবে।

পৃথিবীর সর্বত্রই পরিবহণ ব্যবস্থার দ্বারা পরিবেশ দূষণ ঘটছে কোথাও কম, আবার কোথাও বা বেশি। উদাহরণস্বরূপ যানবাহন হতে নির্গত ধোঁয়া বাতাসে মিশে বায়ু দূষণ ঘটায় এবং সেগুলো মানব দেহে নানা প্রকার রোগ ব্যাধির প্রকোপ দেখা যায়, উদ্ভিদ রাজি মরে যায় এবং প্রাণীকুল ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

২) বিভিন্ন যানবাহন দ্বারা দূর্ঘটনা বৃদ্ধি ঃ সর্বত্রই বিভিন্ন যানবাহন দ্বারা দূর্ঘটনা ঘটছে, তা যেন নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। এতে অজস্র লোক মারা যাচ্ছে এবং অনেকে পঙ্গু হচ্ছে।

৩) যানজট সম্যসা ঃ বিশ্বে সর্বত্র বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যানবাহনের তুলনায় রাস্তাঘাটের সংখ্যা অপ্রতুল, ভঙ্গুর, সরু ইত্যাদি। তাছাড়া যানবাহন চালকবৃন্দ সহ যাত্রী সাধারণ কোন ট্রাফিক আইন মেনে চলে না। ফলে রাস্তা ঘাটে যানজট সর্বত্র এবং সর্বদাই লেগে থাকে, নষ্ট করে অনেক সময়।

৪) পার্কিংগত সমস্যা ঃ তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশেই বিশেষ করে শহরগুলোতে যানবাহন পার্কিং এর জন্য কোন স্থান নেই। ফলে কেনা কাটা এবং প্রয়োজনীয় কার্যাদির নিমিত্তে গাড়ীগুলোকে রাস্তার উপর রাখতে হয়।

৫) অসম পরিবহণ ব্যবস্থা ঃ পৃথিবীর সর্বত্রই বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অসমভাবে উন্নয়ন ও পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে উঠে। ফলে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে অসম অবস্থা বিরাজ করছে এবং স্বাভাবিক কারণেই কোন প্রকার সংযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সংমিশ্রণ অবস্থা বজায় থাকার কারণেও কোন প্রকার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব।

৬) সিগন্যালিং ও ট্রাফিকিং পদ্ধতিগত সমস্যা ঃ উন্নত বিশ্বে সঠিক সিগন্যালিং ও ট্রাফিকিং ব্যবস্থা বজায় থাকলেও অনুন্নত দেশগুলোর বিশেষ করে শহরাঞ্চলের কোথাও এ ধরনের ব্যবস্থা নেই বা থাকলেও সেকেলের সঠিক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ সহ প্রতিপালিত হয় না।

৭) সরকারী পরিবহণ ব্যবস্থায় অপ্রতুলতা সমস্যা ঃ সারা বিশ্বের তথা অনুন্নত বিশ্বে যে হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং লোকজনের বিভিন্ন কারণে যাতায়াত বেড়েছে সে তুলনায় যানবাহনের সংখ্যা খুবই কম বিধায় নানা রকম সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে।

৮) পায়ে হেঁটে চলাচলকারীসহ রিকসা ভ্যান ইত্যাদি জনিত সমস্যা ঃ উভয় বিশ্বের শহরগুলো বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের চলমান সড়কগুলোতে সাধারণ পথচারীসহ রিকশা, ভ্যান ইত্যাদি শ্লথ গতি সম্পন্ন যানবাহন চলাচলের কোন বিকল্প সড়ক/রাস্তাঘাট নেই হেতু সকল প্রকারের যানবাহন একই সড়ক ব্যবহার করে থাকে, ফলে নানা রকমের সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৯) মানুষের অটোমোবাইল যানবাহনের উপর নির্ভরশীলতা জনিত সমস্যা ঃ বিশ্বের সকল দেশের লোকজনের মধ্যে অটোমোবাইল ব্যবহার করার প্রবণতা (সেটা স্বল্প স্থান হোক অথবা দূরবর্তী স্থান হোক) দারুনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় অটোমোবাইলের সংখ্যা অপ্রতুল বিধায় নানা রকম সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

১০) ট্রাফিক আইনগত সমস্যা ঃ উন্নত বিশ্বের সবগুলো দেশেই ট্রাফিক আইন ও তার প্রতিপালনের কঠিন অথচ সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান থাকলেও অনুন্নত বিশ্বের কোথাও এর বালাই নেই। সরু সড়ক ব্যবস্থা, ইচ্ছামত বিভিন্ন গতি সম্পন্ন যানবাহন চলাচল, অবৈধভাবে প্রকাশ্য সড়ক পথের উপর নানা রকম কাজে দখল রাখে। ফলে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাছাড়া ট্রাফিক আইন বিদ্যমান থাকলেও তা নানা কারণে প্রতিপালিত হয় না উভয় পক্ষ থেকে।

এছাড়া আরো নানা ধরনের সমস্যা বিদ্যমান।

প্রতিকার/উপায়

১. নতুন করে রাস্তাঘাট নির্মাণসহ তাতে সংযোগ থাকবে ফুটপাত রিক্সাসহ ধীর গতি সম্পন্ন যানবাহন চলাচল পথ।
২. যানবাহন চলাচল ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাঁধা নিষেধ আরোপ করতে হবে এবং সেগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. সড়ক পথের বিভিন্ন স্থানে অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও তা প্রতিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪. নির্দিষ্ট বিরতি পর পর যানবাহনের জন্য পার্কিং এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৫. চলতি ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে নুতন করে সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
৬. প্রচুর পরিমাণ ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. স্থল পরিবহণ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত _________, যার শুরু _______________ সালে।

২. ____দ্বিতীয় বৃহত্তম রেলপথ যেটি _________ বিভিন্ন বর্তমানে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ________ সংযুক্ত করেছে।

৩. মস্কো হতে বাকু হয়ে ___________ ভিতর দিয়ে কৃষসাগর তীরস্থ ________বন্দরর পর্যন্ত গিয়েছে।

উত্তরঃ ১. রেলপথ, ১৮২৫ ২. রাশিয়ার, মধ্য এশিয়ার, দেশসমূহকে ৩. আজারবাইন, জর্জিয়ার, বাটম।

সঠিক বাক্যের পাশে টিক চিহ্ন এবং ভুল বাক্যের পাশে ক্রস চিহ্ন দিন।

১. বাস্পচালিত ইঞ্জিন চালু হয় ১৯২৫ সালে।

২. পৃথিবীর বুকে বাণিজ্যিক রেলপথের পরিমাণ ৮০০০ মাইলের বেশি।

৩. ট্রান্সসাইবেরীয়ান রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৮৬৪০ কিমি প্রায়।

৪. চিলি-আর্জেটাইন রেলপথটি সবচেয়ে ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন রেলপথ।

৫. ট্রান্স ক্যাস্পিয়ান রেলপথের একটি শাখা আফগানিস্তানের সীমান্ত শহর কুশক পর্যন্ত গিয়েছে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. রেলপথগুলো সাধারণতঃ সরকারেরর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়ার পিছনে কারণগুলো উল্লেখ করুন।

২. মহাদেশীয় রেলপথ বলতে কি বুঝায়? উদাহরণ দিন।

৩. ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেলপথের বিবরণ দিন।

৪. কেপ-কায়রো রেলপথের গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. পরিবহণ ব্যবস্থায় সড়ক পথের গুরুত্ব লিখুন।

২. পরিবহণ ব্যবস্থায় রেলপথের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৩. পৃথিবীর রেলপথসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৪. বিভিন্ন প্রকার পরিবহন ব্যবস্থার তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করুন।

৫. পরিবহণ ব্যবস্থার সমস্যা ও এর প্রতিকার লিখুন।